BHARAT-MAHILA, Registered. No. C. 367

চতুর্থ ভাগ। মাঘ, ১৩১৫। ১০ম সংখ্যা।

ভারত-মহিলা

সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

শ্রীসরযূবালা দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

সূচী।

BHARAT-MAHILA OFFICE—210/6, Cornwallis Street, Calcutta

ভারত-মহিলা কার্য্যালয়—২১০।৬ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

[অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।০ আনা] [বর্ত্তমান সংখ্যার মূল্য ।০ আনা।]

সূচীপত্র।

---

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

ত্রুটী স্বীকার।

আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রটী সঙ্কটাপন্ন পীড়িত হওয়াতে আমি গত কয়েক মাস "ভারত-মহিলার" কাজ প্রায় কিছুই দেখিতে পারি নাই। চিকিৎসকগণের পরামর্শে তাহাকে লইয়া নানা স্থানে ঘুরিয়াছি। যাঁহার উপর পত্রিকা পরিচালনের ভার ছিল তিনিও অধিকাংশ সময় কলিকাতা থাকিতে পারেন নাই। এজন্য পত্রিকা প্রকাশে মাঝে মাঝে অনিয়ম ঘটিয়াছে। গ্রাহক গ্রাহিকা-গণ আমাদিগের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটী দয়া করিয়া মার্জ্জনা করিলে বাধিত হইব।

ভগবানের আশীর্ব্বাদে সন্তানটী রোগমুক্ত হইয়া স্বাস্থ্যলাভ করিয়াছে। ফাল্গুণ মাসের পত্রিকা ১৫ই ফাল্গুণ ডাকে দেওয়া হইবে। চৈত্রের কাগজ চৈত্রের প্রথম সপ্তাহেই গ্রাহকদিগের হস্তগত হইবে।

শ্রীসরযূ বালা দত্ত।

সিঙ্গারের শেলাইয়ের কল।

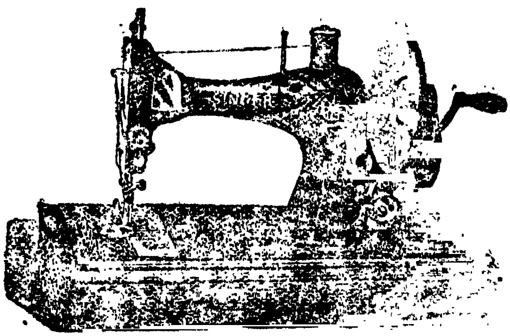
শেলায়ের কল অত্যন্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য ইহা সকলেই একবাক্যে বহুদিন হইতে স্বীকার করিয়া আসিতেছেন

এক্ষণে যিনি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক তাহার প্রথম প্রশ্ন এই—কোন্ কল সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ?

প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ সিঙ্গারের কল ক্রয় করিয়া প্রত্যক্ষ উপায়ে জনসাধারণ এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। আজ পর্য্যন্ত সিঙ্গার কোম্পানীর বিংশতি কোটীর উপর কল বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। ইহাতেই সকলে সিঙ্গারের কলের উৎকৃষ্টতা বুঝিতে পারিবেন। ইহার শিল্প কৌশল সর্ব্বোৎকৃষ্ট, গতি অতি দ্রুত, চালাইতে কিছুমাত্র পরিশ্রম নাই, ইহার শিক্ষাপ্রণালী অত্যন্ত সহজ, ইহা খুব মজবুত, দীর্ঘকাল স্থায়ী। তুলনায় উৎকৃষ্টতা বুঝিতে পারিয়া 'ভারত মহিলা' সম্পাদিকা স্বয়ং সিঙ্গারের কল ব্যবহার করিতেছেন।

সহজ শেলাই, নানা রকমের বিচিত্র শেলাই, ছোট ও বড় উভয় প্রকারের বখেয়া ও শিকলের ন্যায় শেলাই; প্রভৃতির উপযোগী চারি শত প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন কল আমরা প্রস্তুত ও আমদানী করিয়া থাকি।

যাহারা একবারে পূর্ণ নগদ মূল্যে কল ক্রয় করিতে সমর্থ নহেন তাহারা মাসিক কিস্তিবন্দীর নিয়মে ধারে কল লইতে পারেন।



	মূল্য—নগদ	কিস্তীবন্দী হিসাবে ধারে।
৪৮ কে হাতকল	৫০৲	৬০৲
ঐ পা কল	৬৮৲	৮০৲
২৮ কে ডি, এস হাত কল	৬০৲	৭০৲
ঐ পা কল	৭৫৲	৮৭৲

এই দুই প্রকার কলই গৃহকার্য্যে বিশেষ উপযোগী। কলের সঙ্গে আনুসঙ্গিক প্রয়োজনীয় সকল জিনিষই বিনামূল্যে দেওয়া হয়। কলের ঢাকনির মূল্য স্বতন্ত্র। গুণানুসারে ঢাকনির মূল্য ৯৲ হইতে ১৩৲ টাকা। দরজীদিগের উপযোগী বিবিধ মূল্যের কল বিক্রয়ার্থ মজুত আছে। মূল্য নিরূপণ পুস্তক ও অন্যান্য বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রধান আফিস ৪নং ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতায় শাখা আফিস ১৫৮নং বহুবাজার, বঙ্গদেশে শাখা আফিস ঢাকা, কুমিল্লা, রংপুর জলপাইগুড়ি, নাটোর, গৌহাটী, দার্জ্জিলিং, ডিব্রুগড়, বরিশাল ও খড়্গপুর।



কুমারী তরু দত্ত ও তাঁহার ভগিনী
শিল্পকলা-নিপুণা অরু দত্ত।

ভারত-মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে
রমন্তে তত্র দেবতা।

The woman's cause is man's ; they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free ;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow ?

Tennyson.

৪র্থ ভাগ। | মাঘ, ১৩১৫। | ১০ম সংখ্যা।

শব্দ-তত্ত্বে নারী-গৌরব।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস লিখিত হয় নাই। ইতিহাস বলিয়া যাহা প্রসিদ্ধ, তাহাও কাব্যপ্রিয় কবির লেখনী-প্রসূত। সেই সকল পুস্তকে ইতিহাস থাকিতে পারে, কিন্তু কোন্‌টী প্রকৃত ইতিহাস, কোন্‌টী কবি কল্পনা-প্রসূত, তাহা অবধারণ করা সহজ নহে। ভারতীয় আর্য্যজাতির প্রাচীন যুগের উপরে ও পূর্ব্বপুরুষদিগের উপরে অচলা ভক্তি, সুতরাং ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাসের প্রয়োজন আছে। শিক্ষা, দীক্ষা, সভ্যতাতে যদি পূর্ব্ব-পুরুষগণ সমুন্নত হয়েন, তবে তাঁহাদের বংশধরেরা তাহা জানিতে পারিলে সেইরূপ সমুন্নত হইবার নিমিত্ত তাহাদিগের স্বতঃপ্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। এই জন্যও প্রাচীন ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা আছে। যখন লিখিত ইতিহাস নাই, তখন অন্য প্রকারে তাহা আহরণ করিবার জন্য যত্নের প্রয়োজন। প্রাচীন কাব্য নাটক হইতে আমরা তাৎকালিক সামাজিক ইতিহাস সংগ্রহ করিতে পারি, সমাজের উপর স্ত্রীজাতির কতখানি অধিকার ছিল, তাঁহাদিগের শিক্ষা দীক্ষা কিরূপ ছিল তাহা জানিতে পারি। প্রাচীন শিলালিপি, তাম্রশাসন, প্রাচীন-মন্দির ও অট্টালিকার গঠন-প্রণালী ও তাহাতে উৎকীর্ণ লিপি, বিভিন্ন সময়ের রাজাদিগের মুদ্রিত মুদ্রাসমূহ এ বিষয়ের অনেক সাহায্য করিবে। নাবিকদিগের, কৃষকদিগের ভিক্ষুক বৈষ্ণব বৈষ্ণবীদিগের সঙ্গীত হইতে ও পুরস্ত্রী-সমাজে প্রচলিত কবিতা হইতে, রূপকথা হইতে, আমরা অনেক তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি। জগতে যত ভাষা আছে, সর্ব্বাপেক্ষা সংস্কৃত ভাষা সমুন্নত। সংস্কৃত ভাষার শব্দ-সম্পদের মত কোন ভাষার সম্পদ নাই। কোন অরণ্যানীর মধ্যে যদি একটী প্রাচীন রাজগৃহ দেখিতে পাই, শ্বাপদনিষেবিত সেই রাজগৃহ

দেখিতে দেখিতে সেই ভগ্ন স্তূপের মধ্যে যদি তাহার কোষাগারে প্রবিষ্ট হই, আর সেই গৃহে সংস্থিত যদি উজ্জ্বল হীরক প্রভৃতি নানাবিধ মণি মাণিক্য দেখিতে পাই, তবে আমরা সিদ্ধান্ত করিব, যে সেই মণি মুক্তা হীরক গুলির ব্যবহার রাজা ও রাজমহিষী জানিতেন, নিশ্চয় এগুলি তাঁহাদিগের অলঙ্কারের শোভা বর্দ্ধন করিত। সেইরূপ আমরা সংস্কৃত-প্রাসাদের কোষাগারে প্রবিষ্ট হইয়া সংস্কৃত অমূল্য শব্দরাশিরূপ মহার্ঘ্যরত্ন রাশি হইতে প্রাচীন যুগের সভ্যতার ইতিহাস আহরণ করিতে সমর্থ হইব।

সূর্য্যমণ্ডল হইতে বিচ্যুত হইয়া সৌর জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, বৈজ্ঞানিকদিগের এই সিদ্ধান্ত। সূর্য্যের অন্যান্য নামের মত সংস্কৃত "সবিতা" একটী নাম আছে। সবিতা শব্দ সূ ধাতু হইতে উৎপন্ন, সূ ধাতুর অর্থ প্রসব। এই শব্দটী দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারি, প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতগণ এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অবগত ছিলেন। গ্রহমণ্ডল পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে, ইহাও বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। ভারতীয় পণ্ডিতগণ যে ইহা অবগত ছিলেন, আমরা গ্রহ দিগের "গ্রহ" নাম দেখিয়া অবধারণ করিতে পারি। সমস্ত গ্রহের কক্ষ অপেক্ষা শনির কক্ষ বৃহৎ। অন্যান্য গ্রহ নিজ নিজ কক্ষে ভ্রমণ করিয়া পূর্ব্বস্থানে উপস্থিত হইবার অনেক পরে শনিগ্রহ পূর্ব্বস্থানে উপস্থিত হয়। সংস্কৃত সাহিত্যে শনির নাম "শনৈশ্চর" ও "মন্দ" রহিয়াছে। এক্ষণে বুঝিতে পারা যায়, প্রাচীন ভারতে এই তথ্য অজ্ঞাত ছিল না। 'কেতু' শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত। আকাশ মণ্ডলে অনেক ধূমকেতুগ্রহ (Comet) আছে, প্রাচীন কাল হইতে এই বহুবচন তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মঙ্গল গ্রহের এক নাম ভৌম। এই পৃথিবীর সহিত মঙ্গলগ্রহের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, এতদিনে বৈজ্ঞানিকগণ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু ভারতীয় মনীষিগণ যেন এই শব্দের সৃষ্টি করিয়া বহু যুগযুগান্তর পূর্ব্বে ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বায়ু গৃহের মলিন অঙ্গারাম্ল (Carbonic Acid Gas) ও দুর্গন্ধ অপসরণ করে, ইহা অবগত হইয়াই প্রাচীন পণ্ডিতগণ বায়ুর পবন নাম রাখিয়াছেন। পবন অর্থ পবিত্রতাকারী। বায়ুশূন্য স্থানে অগ্নি থাকে না, এইটুকু জানিতেন বলিয়াই প্রাচীন পণ্ডিতগণ অগ্নির নাম 'বায়ুসখ' রাখিয়াছেন। গৃহাভ্যন্তরস্থ বায়ুকে তরল করিয়া বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু গৃহে আনয়ন করে বলিয়া এবং গৃহাভ্যন্তরস্থ দুষ্ট কীটাণুদিগের ধ্বংস সাধন করে বলিয়া অগ্নি ভারতীয় পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক 'পাবক' এই নামে আখ্যাত হইয়াছে, বোধ করি আমরা এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারি।

আজ 'ভারত-মহিলার' মাননীয়া পাঠিকাদিগকে আমি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতে মহিলাদিগের কিরূপ শিক্ষা দীক্ষার প্রসার ছিল ও সমাজের উপরে স্ত্রীজাতির কিরূপ আধিপত্য ছিল এই শব্দতত্ত্ব হইতে আহরণ করিয়া কিঞ্চিৎ উপহার দিতে চেষ্টা করিব। সংস্কৃত সাহিত্যে ও কোষে 'উপাধ্যায়ী' ও 'উপাধ্যায়া' এই দুইটী শব্দ দেখিতে পাই। মহর্ষি পাণিনি তাঁহার অষ্টাধ্যায়ী পাণিনীয় ব্যাকরণে উপাধ্যায়ের পত্নী এই অর্থে 'উপাধ্যায়ানী' এই শব্দ সাধনের জন্য সূত্র করিয়াছেন। বার্ত্তিককার এই সূত্রের আর একটী বার্ত্তিক সূত্র করিয়াছেন। বার্ত্তিক সূত্রে স্বয়ং অধ্যাপনা করিলে 'উপাধ্যায়ী' ও 'উপাধ্যায়া' এই শব্দদ্বয় নিষ্পন্ন হয়। * কোষকার, যে স্ত্রী অধ্যাপনা করেন এই অর্থে 'উপাধ্যায়ী' ও 'উপাধ্যায়া' শব্দের কীর্ত্তন করিয়াছেন। † এই পঞ্চদশ কোটী ভারতবাসিনী স্ত্রীজাতির মধ্যে গার্গী, মৈত্রেয়ী, সীতা, দময়ন্তী, দ্রৌপদী, কুন্তী, খনা, লীলাবতীর নাম করিয়া আমরা গর্ব্বে স্ফীত হইতে পারি না। মণ্ডন মিশ্রের পত্নীর নিকটে শঙ্করাচার্য্য বিচারযুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন, কালিদাস কর্ণাট-রাজমহিষীর নিকটে সংস্কৃত কবিতা রচনা করিয়া পরাভূত হইয়াছিলেন বলিয়া আমরা অহঙ্কৃত হইতে পারি না। কারণ এই পঞ্চদশকোটী মহিলার ভিতরে দুই চারটী বিদুষীর নামোল্লেখ পর্য্যাপ্ত নহে। পক্ষান্তরে আমরা ইহাও বলিতে পারি যে, ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতির মত পুরুষজাতির মধ্যেই বা উল্লেখ-

---

* "ঙীষ্ বা ঙীষ্ বাচ্যঃ। উপাধ্যায়া। উপাধ্যায়ী যা তু স্বয়মেবাধ্যাপিকা" ইতি সিদ্ধান্তকৌমুদী।

† "উপাধ্যায়াপ্যুপাধ্যায়ী স্যাদাচার্য্যাপি চ স্বতঃ।"—অমরকোষ।

যোগ্য মহাকবি কয়জন ছিলেন? গৌতম, কণাদ, কপিল, পতঞ্জলি, ব্যাস, জৈমিনির মতই বা কয়জন দার্শনিক ছিলেন? প্রতিভাশালী মনুষ্য সকল জাতির মধ্যেই পরিমিত। কিন্তু পুরুষের মত যে সমাজে স্ত্রী জাতিকেও অধ্যাপকের উচ্চাসন প্রদান করা হইত, সে সমাজে ও সে জাতিতে শিক্ষিতা নারীর সংখ্যা অল্প নহে। পরিমিত-সংখ্যক ব্যক্তির জন্য সাহিত্যে নির্দ্দিষ্ট কোন শব্দ অধিকার লাভ করে না। দুই চারিটী শিক্ষিতাকে বুঝাইবার নিমিত্ত অবশ্য একটী শব্দের সৃষ্টি হয় নাই। দুই চারিটী নারী শিক্ষিতা হইলেও সমাজ তাহাদিকে অধ্যাপনার মত গুরুভার অর্পণ করিয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে না। ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের মধ্যে সকলেরই অধ্যয়ন ছিল, বেদে অধিকার ছিল, তথাপি শাস্ত্রের অনুশাসনে অধ্যাপনার অধিকার লাভ করিতে পারেন নাই। স্ত্রীজাতিকে এই অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া সমাজের উপর স্ত্রীজাতির কতদূর প্রভাব পরিব্যাপ্ত ছিল ও শিক্ষিতা স্ত্রীলোকের কিরূপ সংখ্যাধিক্য ছিল, 'ভারত-মহিলার' পাঠিকাগণ অবধারণ করিবেন। আর যে পুরুষ গর্ব্বিত হইয়া স্ত্রীজাতিকে কেবল রন্ধনশালায় প্রেরণ করিবার জন্য উপদেশ দিয়া থাকেন, তাঁহারাও একবার ভাবিয়া দেখিবেন যে, প্রাচীন ভারতের স্ত্রীজাতি কেবল দর্ব্বীসঞ্চালনে নিযুক্ত ছিলেন না, লেখনী সঞ্চালনেও তাঁহারা সিদ্ধহস্তা ছিলেন। চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় চতুর্ব্বিধ সুমিষ্ট অন্ন প্রস্তুত করিয়াও তাঁহারা অধ্যাপনার গুরুভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য জগতে যেমন মনস্বিনী লেটিসিয়া (Letitia) মহাবীর নেপোলিয়নকে প্রসব করিয়াছিলেন, প্রাচীন ভারতেও শৌর্য্যেবীর্য্যে মহীয়সী কুন্তীও সেইরূপ ভীমার্জ্জুনকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কে বলিবে, বাল্মীকির মাতা বিদুষী ছিলেন না, মহাকবি কালিদাসের মাতা সুকবি ছিলেন না? সেদিনেও তরুলতা দত্ত ইংরেজী ও ফরাসীভাষায় সুমিষ্ট কবিতা লিখিয়া পাশ্চাত্য জগতকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাকবি মধুসূদন দত্ত ইংরেজী কবিতা লিখিয়া কয়টী ইংরেজকে মোহিত করিতে পারিয়াছিলেন? অবশেষে তিনি বাঙ্গালা ভাষায় কবিতা লিখিয়া প্রথম শ্রেণীর কবির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক-দুহিতা জয়ন্তী দেবীর দীর্ঘচ্ছন্দের সংস্কৃত কবিতা পাঠ করিলে রোমাঞ্চিত হইতে হয়। পাণ্ডিতা রমাবাই সরস্বতী সংস্কৃতে কবিতা লিখিয়া অধ্যাপক সংস্কৃত কবিদিগকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। জ্ঞানদাসুন্দরীর সংস্কৃত কবিতা প্রায়ই "মিত্র-গোষ্ঠী" পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে। শুধু কেবল গর্ব্বিত বাঙ্গালী লেখকই স্ত্রীজাতিকে দর্ব্বীচালনার উপদেশ দিতেছেন না; দার্শনিক জগতে যিনি প্রখ্যাত, ইউরোপে যাঁহার নাম এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে প্রতিধ্বনিত, সেই মহামনা হারবার্ট স্পেনসারেরও দেখিয়া শুনিয়া মতিভ্রম হইয়াছিল। তিনি কেবল পুরুষ-সেবার উপযোগিনী করিবার জন্য, পুরুষের মনোহারিণী করিবার জন্যই স্ত্রীজাতির সৃষ্টি, ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। * আমাদিগের স্ত্রীজাতির মধ্যে একটী প্রচলিত আভাণক (Proverb) আছে, "যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না?" রাণী দুর্গাবতী ও চাঁদবিবির কথা স্মরণ করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, নারীজাতি সম্মার্জ্জনীর চালনায় যেমন অভিজ্ঞ, তেমনই তরবারী চালনায়ও তাঁহাদিগের যোগ্যতা আছে। বৃদ্ধ মনু স্ত্রী জাতির উপরে গৃহরক্ষার ভার, পরিবার পালনের ভার, পুত্রকন্যাদিগকে শিক্ষার ভার ও ব্যয় করিবার ভার দিয়াছেন, আর পুরুষদিগের উপরে কেবল অর্থাহরণের ভার অর্পণ করিয়াছেন। এই জন্যই বেদে নবপরিণীতা বধূকে গৃহরাজ্যের "সম্রাজ্ঞী হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ-মন্ত্র রচিত হইয়াছে। তন্ত্রেও স্ত্রীজাতির নিকটে দীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীজাতির প্রদত্ত মন্ত্র অধিক ফলপ্রদ কথিত হইয়াছে। মন্ত্র বিচার করিবার সামর্থ্য না থাকিলে মন্ত্র দিতে পারে না, সুতরাং প্রাচীন ভারতে স্ত্রীজাতির যে তন্ত্রশাস্ত্রে পারদর্শিতা ছিল, তাহা প্রমাণ হইতেছে। কোষকার জ্যোতিষশাস্ত্র অভিজ্ঞা স্ত্রীলোকের "বিপ্রশ্নিকা," "ঈক্ষণিকা" ও "দৈবজ্ঞা" এই তিনটী নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন *। ইহা দ্বারাও

* Herbetr Spence's Education PP. 187—88.

* বিপ্রশ্নিকাতীক্ষণিকাদৈবজ্ঞা —অমরকোষ।

প্রাচীন ভারতে স্ত্রীজাতি শিক্ষা দীক্ষায় কতদূর উন্নত ছিলেন, বুঝিতে পারা যায়। এই শিক্ষা দীক্ষা সমাজে প্রচলিত ছিল বলিয়াই প্রাচীন সমাজ খনা, লীলাবতীর সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন। নারীজাতির পক্ষে ইহা কম সৌভাগ্যের বিষয় নহে যে, "অম্ভৃণ" ঋষির কন্যা "বাক্" ব্রহ্মজ্ঞানে বিহ্বল হইয়া যে সূক্তের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেই সূক্তটীই ঋগ্বেদে দশম মণ্ডলে দেবীসূক্ত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। সর্ব্বত্র এই দেবীসূক্তের আদর। বেদশূন্য বঙ্গদেশেও দুর্গাপূজার সময়ে দেবীসূক্ত পঠিত হইয়া থাকে। এই দেবীসূক্তের ভাব গ্রহণ করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ গীতার সৃষ্টি করিয়াছেন। দেবীসূক্ত দেখিয়াই শঙ্করাচার্য্যের ব্রহ্মভাব উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। পৌরাণিকযুগে এই বাক্ই বোধ হয় বাগ্দেবী নামে অভিহিত হইয়াছেন ও সরস্বতী বলিয়া পূজা গ্রহণে অধিকার পাইয়াছেন। এক্ষণে ভগিনীদিগের মধ্যে অনেকেই শিক্ষা দীক্ষা লাভ করিয়াছেন। অনেকেই বি, এ, এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষায় অনেকেই উপাধি লাভ করিয়াছেন। অনেকেই প্রবন্ধ ও কবিতা লিখিতেছেন। সেজন্য নারীসমাজের গৌরব বর্দ্ধিত হইতেছে, সন্দেহ নাই। তথাপি আমি ভগিনীদিগের নিকট বিনীত ভাবে প্রার্থনা করি যে, তাঁহারা যেন মধুর ছন্দে, মধুর পদাবলীতে কেবল মধুর রসের অবতারণা না করেন। একান্ত প্রেমগাথা গাহিয়া তাঁহাদিগের সঞ্চিত প্রতিভাটুকুর যেন অপচয় না করেন। জিহ্বা একান্ত মধুর রস চায় না, তিক্ত, কষায়, কটু, অম্ল ও লবণের প্রয়োজন হয়। ভগিনীদিগের মধ্যে অনেকেই এখনও পাকপ্রণালী ভুলেন নাই, সেইজন্যই শুক্তনির কথা তুলিতেছি। যে শ্রীকৃষ্ণ মধুর বংশীধ্বনিতে জগৎ মাতাইয়াছিলেন, তিনিই আবার পাঞ্চজন্য শঙ্খের গভীর মেঘমন্দ্র ধ্বনিতে জগৎ স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। সৌদামিনী হাসিয়া মেঘের উপরে পদাঘাত করিয়া গভীর বজ্রনাদ উত্থিত করে। ত্রিতন্ত্রী বীণার ঝঙ্কারও মধুর, দিগন্তব্যাপী [illegible] মেঘধ্বনিও মধুর। শুধু বীণার ধ্বনি মিষ্ট হয় না, মৃদঙ্গের গভীর ধ্বনির সহিত মিলিত বীণার ধ্বনি মধুর। পুতুলের বিবাহরূপ ক্রীড়ায় বাল্যকালেই আমোদ হয়, প্রৌঢ়কালে হয় না। আর অধিক লিখিয়া পাঠিকা ও পাঠকদিগকে বিরক্ত করিতে চাই না।

শ্রীজগদীশ্বরী দেবী।

ধর্ম্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠা।

৭

নব সংকল্প।

নলিনীদের বাড়ীর একটী কক্ষে মলিনার প্রাণহীন দেহ শায়িত। প্রভাত-তপন লোহিত বসনে সাজিয়া, অন্ধকারের আবরণ সরাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে কলিকাতা সহরকে আলোকিত করিল এবং বায়ু সম্মুখের উদ্যান হইতে ফুলের গন্ধ বহন করিয়া বাতায়ন-পথে মলিনার গৃহে প্রবেশ করিতে লাগিল।

নারায়ণ রাও এবং তাঁহার পত্নী মলিনার মৃতদেহ সম্বন্ধে তাহার আত্মীয় স্বজনদের কি ইচ্ছা, জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা সকলেই মলিনাকে একবার শেষ দেখা দেখিতে চাহিল।

আচার্য্য এবং নারায়ণ রাও এ বিষয় পরামর্শ করিতে নলিনীদের বাড়ী গেলেন। নারায়ণ রাও বলিলেন:—

"আমি শোকের অভিনয় কখনও ভালবাসি না। কিন্তু সেই হতভাগ্য নরনারীরা মলিনার মৃতদেহকে একবার দেখতে আর তার প্রতি তাদের শেষ সম্মানটুকু দেখাতে চায়। তাদের এই ইচ্ছা কি করে অপূর্ণ রাখা যায়? আপনি কি মনে করেন অমরেন্দ্র বাবু? এ বিষয়ে আপনার আর নলিনীর যা মত তাই করাই সব চেয়ে ভাল আর ঠিক হবে।"

আচার্য্য বলিলেন:—"এ বিষয়ে আপনি যা মনে করেন আমিও তাই মনে করি। শোকের বহিঃপ্রকাশ আমিও ভালবাসি না। শোক সম্ভোগের বস্তু, প্রদর্শনের নয়। কিন্তু এটা অন্য রকম। আমার মনে হয়, মলিনাকে তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে সেখানে উপাসনা হলেই সব চেয়ে ভাল হয়। তুমি কি মনে কর, নলিনী?"

নলিনী দুঃখিতভাবে বলিলেন—"হাঁ, তা হলে ঠিক হয়। বেচারি! আমার সময় সময় মনে হয়, সে আমারি জন্য প্রাণ দিয়াছে। আমরা অবশ্যই শোকের অভিনয় করতে চাই না। তার আত্মীয়স্বজনদের ইচ্ছা পূর্ণ হোক্। এতে আমি কোন দোষ দেখি না।"

নলিনী বাগান হইতে কয়েকটি ফুল তুলিয়া মলিনার দেহকে সাজাইয়া দিলেন এবং আচার্য্য, অধ্যাপক, সুরেন্দ্র বাবু ও সুধীর সরলা এবং নলিনীকে লইয়া তাঁবু অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মলিনার দেহকে যখন লইয়া যাওয়া হইল, তখন তাঁবু লোকে পূর্ণ হইয়া উঠিল। সরলা গান গাহিলেন, উপাসনা হইল এবং তাহার পর বহুসংখ্যক নরনারী অশ্রুপূর্ণ নয়নে মলিনার বিবর্ণ মুখ একবার চিরদিনের মত দেখিয়া লইল এবং তৎপর, মলিনার মরদেহ শ্মশানে ভস্মীভূত হইয়া গেল; কিন্তু তাহার মৃত্যু তাহারই ন্যায় কতকগুলি রমণী এবং পুরুষকে পরিবর্ত্তিত জীবন দান করিয়া গেল। আজ অনেকের চক্ষু হইতে অনুতাপের উষ্ণ অশ্রু প্রবাহিত হইল তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই রমণী।

মলিনাকে কে আঘাত করিয়াছিল তাহার অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না। পৃথিবীর বিচারালয়ে মলিনার হত্যাকারীর কোনই দণ্ডবিধান হইল না।

রাত্রিতে মন্দিরের উপাসনায় আচার্য্য এই সকল কথা বলিলেন। এই সহরে মদের দোকান দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে। শিক্ষিত ভারতসন্তান কি ইহার জন্য অপরাধী নহেন? যদি সমস্ত শিক্ষিত ভারতবাসী মিলিত হইয়া ইহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেন, তাহা হইলে দেশে ইহার প্রভাব এত বিস্তৃত হইত কি? মদের দোকান অক্ষুণ্ণ প্রভাবে কলিকাতায় রাজত্ব করিয়া আসিতেছে, অথচ কেহই ইহাকে দূর করিতে চেষ্টা করেন নাই। মহাপুরুষেরা কি করিতেন?

যে হস্ত মলিনাকে তাহার পাপের পথে এত আগ্রহের সহিত সাহায্য করিয়াছিল সেই হস্তেই তাহার মৃত্যু হইল। আর এই বিষম বিষ অনুক্ষণ শত মলিনার শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক বিনাশ সাধন করিতেছে।

এই সকল কথা বলিতে আচার্য্যের কণ্ঠস্বর কম্পিত হইতেছিল, মাঝে মাঝে ক্রন্দন আসিয়া তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ করিয়া দিতেছিল। তিনি যখন বলিতেছিলেন, মন্দিরের নর নারী অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিলেন।

অধ্যাপক আনন্দমোহন বেদীর নিকটে অবনত মস্তকে বসিয়াছিলেন, অবিরল অশ্রুধারা তাঁহার গণ্ড বাহিয়া পড়িতেছিল। পূর্ব্বে প্রকাশ্যস্থানে আপন মনের ভাবকে তিনি কখনও এইরূপে প্রকাশিত হইতে দেন নাই। অরবিন্দ বাবু তাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে দুই হাত দৃঢ় সংবদ্ধ করিয়া বসিয়াছিলেন। এই কয় সপ্তাহ তাঁহার মনের উপর দিয়া কি সংগ্রাম চলিয়া গিয়াছে! তাঁহারা যে বড় বিলম্বে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন এই চিন্তা সম্পাদকের হৃদয়ে বজ্রের ন্যায় আঘাত করিতেছিল। আজ তিনি যাহা করিতেছেন বহুপূর্ব্বে তাহা করেন নাই কেন? বহুপূর্ব্বে মহাপুরুষদের অবলম্বিত প্রণালীতে কাগজ সম্পাদন করিলে, আজ তাহার ফল কি হইত কে বলিতে পারে?

উপরে গানের জায়গায় সরলা একপ্রকার অব্যক্ত যাতনা হৃদয়ে লইয়া বসিয়াছিলেন। প্রার্থনার পর তিনি গান গাহিতে উঠিলেন। তিনি গান ধরিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু গানের পরিবর্ত্তে তাঁহার মুখ হইতে একপ্রকার অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি নির্গত হইল। সেই বিখ্যাত গায়িকা তাঁহার জীবনে আজ সর্ব্বপ্রথম গাহিতে অসমর্থ হইয়া উঠিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন।

পরের কয়েক মুহূর্ত্ত মন্দির হইতে কেবল ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। আজ আর আচার্য্য প্রতিজ্ঞাগ্রহণকারীদিগকে সমবেত হইতে অনুরোধ করিলেন না; কিন্তু উপাসনার পর জনতা যখন অনেক কমিয়া গেল, আচার্য্য প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝিতে পারিলেন যে প্রতিজ্ঞাগ্রহণকারীর সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে।

আজকের কার্য্য অনুতাপ, ক্রন্দন এবং অসংলগ্ন প্রার্থনাতে পরিণত হইল। আজ তাঁহারা সকলে মদ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হৃদয়ে লইয়া গৃহে ফিরিলেন।

মলিনার মৃত্যু নলিনীর ন্যায় আর কাহাকেই এত আঘাত করিল না। ইহা তাঁহার ব্যক্তিগত ক্ষতির ন্যায় বোধ হইতেছিল। এক সপ্তাহের সেই সংক্ষিপ্ত সময়টুকু—যে সময় মলিনা তাঁহার কাছে ছিল—নলিনীর হৃদয়ে এক নূতন রাজ্য খুলিয়া দিয়া গিয়াছিল। পর দিন তাঁহাদের বাড়ীর একটী কক্ষে বসিয়া তিনি সরলার সহিত এ বিষয়ে কথা বলিতেছিলেন।

আগের দিন মলিনার নিস্পন্দ দেহ যেস্থানে শায়িত ছিল সেই দিকে তাকাইয়া নলিনী বলিলেনঃ—"আমি আমার টাকা দিয়া এই রমণীদের অবস্থা উন্নততর করতে চেষ্টা করতে চাচ্ছি। এ বিষয়ে আমি দাদার সঙ্গে পরামর্শ করেছি। তিনিও তাঁর টাকার অধিকাংশ এই কাজে দেবেন!"

সরলা জিজ্ঞাসা করিলেনঃ—"কি করবে?"

"সরলা! এই যে রাজপ্রাসাদের মত বাড়ী, এই সব জাঁকজমক, এতে আমাদের কি দরকার আছে? মহাপুরুষেরা কি করতেন এই প্রশ্নের পর আমি ভাব্‌তে পারি না, যে তাঁরা এই ভাবে বাস করতেন। এই সব চাকচিক্য, যাকে আমরা এতদিন 'সভ্যতা' বলে এসেছি, এ আমায় বিঁধছে। এ যে সভ্যতা নয়—সভ্যতা থেকে অনেক দূরে—তা আমি বুঝ্‌তে পারছি। এ পৃথিবী ঈশ্বর তাঁর সকল সন্তানের জন্যই দিয়াছেন। কিন্তু আমরা যাতে কোনই দরকার নেই এমন সব বিষয়ে শত শত টাকা খরচ করি, আর আমাদেরই ভাই বোনেরা যা নিতান্ত দরকার তারও অভাবে মরে যাচ্ছে। একি ঘোর অবিচার নয়? জীবন ধারণের জন্য যা 'দরকার' শুধু তাই ছাড়া আর একটি টাকায়ও আমার অধিকার নেই। এত দিন যে টাকাকে আমি 'আমার' বলে এসেছি, তা আমার নয়—ঈশ্বরের। এখানে তাঁর প্রতিনিধিরূপে তাঁর টাকার সদ্ব্যবহার করতে আমি বাধ্য। এতদিন যে টাকা আমার নয়, যাতে আমার কোন অধিকার নাই সেই টাকাই আমি নিজের শারীরিক সুখ আর বিলাসিতার জন্য ব্যয় করে আসছিলাম। এখন সাধ্যমত আমাকে তার প্রতিকার করতে হবে। কাজেই একটা ছোট বাড়ীতে গিয়ে দাদা আর আমি থাক্‌ব, আর এই বাড়ীটা—অবশ্য একে বিলাতী সভ্যতা থেকে মুক্ত করে—মলিনার মত হতভাগিনীদের জন্য রাখ্‌ব। কাল কতকগুলি রমণী পরিবর্ত্তিত হয়েছে, দেখেছ। কিন্তু সেই প্রলোভনের জায়গায় থাকলে তারা কি আবার পাপে ডুববে না? এই জন্যই আমি এ বাড়ীটা তাদের জন্য রাখ্‌তে চাই।

"আর নারায়ণ যেখানে তাঁবু ফেলেছেন, সেই মাঠটা আমরা কিনে নেব। সেখানে—যদি ঈশ্বর করেন—একটি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত করব। দেশের এখন প্রধান কাজ সর্ব্ব সাধারণের শিক্ষা। কিন্তু দেশের এমন অবস্থা, যে অধিকাংশ লোকেরই বিদ্যালয়ের খরচ দেবার সামর্থ্য নাই। অবৈতনিক বিদ্যালয় হলেও বই ইত্যাদি কিন্‌তেও অনেকে পারে না। সে রকম ছাত্রীদের বইএর বন্দোবস্ত বিদ্যালয় থেকেই করতে হবে। কিন্তু সরলা, এই সব বিষয় ভাবতে আমার মনে কেবল এই কথা আসছে, যে যতই শক্তি আর অর্থ ব্যয় করা যাক না কেন, মদের দোকান যতদিন সেখানে আছে ততদিন সেখানকার কল্যাণ নেই।"

নলিনী উঠিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সরলা বলিলেনঃ—"তা সত্যি। কিন্তু নলিনি! এই টাকা দিয়ে কি আশ্চর্য্য কাজ হতে পারে! আর মদের দোকান সেখানে চিরদিন থাকবে না। ঈশ্বরের কৃপায় এমন দিন অবশ্য আসবে যখন ভারতবাসীর পবিত্র সংগ্রাম জয়যুক্ত হবে"

নলিনী থামিলেন;—তাঁহার বিবর্ণ আগ্রহপূর্ণ মুখ উৎসাহে জ্বলিয়া উঠিল।

"আমিও তা বিশ্বাস করি। দিন দিনই দেশের লোক জেগে উঠছে। ভারতের সৌভাগ্য আবার ফিরবে। সরলা! আমার সময় সময় মনে হয় যে দেশ এক সময় ধর্ম্মে, জ্ঞানে, বীরত্বে, সভ্যতায় জগতের শীর্ষস্থানীয় ছিল, এখন তার এমন হীনাবস্থা কেন? কেন এমন হল? কিন্তু বিধাতা কোন দেশেরই ভাগ্যে চির অন্ধকার, চির অধীনতা রাখেন নাই। জন্মভূমিকে তাঁর অতীত গৌরবময় স্থানে তুলতে হলে আমাদের নিজেদের প্রাণপণ উদ্যমের দরকার। আমাদের যত

টুকু সামর্থ্য আছে, এসো, তাই আমরা মাতৃভূমির কাজে লাগাই। আর তোমাকে এক কাজ করতে হবে। এ বিষয়ে আমি অনেক ভেবেছি। একটা এই—তুমি জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের গান শেখাবে। তোমার গানে এক শক্তি আছে। মানুষকে উচ্চতর, পবিত্রতর করতে গানের মত আর কি আছে?"

নলিনী থামিবার আগেই সরলার মুখ চিন্তাপূর্ণ হইয়া উঠিল। নলিনীর কথা তাঁহার মনে এমন এক চিন্তা ও ভাব প্রবাহিত করিয়া দিল, যে তাঁহার চোখে জল আসিল। তিনি নিজে যাহা কল্পনা করিয়াছিলেন ইহা ত তাহাই। তাঁহার মনে হইল ইহাই তাঁহার কণ্ঠ স্বরের সর্ব্বোত্তম ব্যবহার।

তিনি সংক্ষেপে "হাঁ" বলিয়া উঠিয়া নলিনীর হাত ধরিলেন এবং দুই জনে উৎসাহের উত্তেজনায় ঘরের মধ্যে বেড়াইতে লাগিলেন। "আমি এই কাজে আনন্দের সঙ্গে আমার জীবন কাটাব। আমি বিশ্বাস করি, মহাপুরুষেরা আমার অবস্থায় এই রকম কাজ করতেন। নলিনি! আমরা এই টাকা দিয়ে কত কাজ করতে পারি।"—নলিনী একটু হাসিয়া বলিলেন:—"আর তোমার মত হৃদয় আর কণ্ঠস্বরের সাহায্যে আমরা অবশ্যই অনেক কাজ করতে পারি।"

সরলা আর কিছু বলিবার আগেই সুধীর সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি একমুহূর্ত্ত দ্বিধা করিলেন, তাহার পর চলিয়া যাইবার জন্য ফিরিলেন। নলিনী তাঁহাকে ডাকিলেন।

সুধীর ফিরিয়া বসিলেন এবং তাঁহারা তিন জনে তাঁহাদের ভবিষ্যৎ কার্য্য সম্বন্ধে কথা বলিতে লাগিলেন। নলিনীর উপস্থিতিতে সুধীর সরলার নিকট সঙ্কুচিত হইলেন না।

কিছুক্ষণ পরে সুধীরকে বাহিরে কে ডাকিল এবং সরলা ও নলিনী অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন।

"আচ্ছা, সুরেশ বসুর কি হয়েছে?" এই প্রশ্ন নলিনী যথেষ্ট সরল ভাবেই করিয়াছিলেন, কিন্তু সরলা লজ্জিত হইয়া উঠিলেন এবং নলিনী একটু হাসিয়া বলিলেন:—"তিনি বোধ হয় আর একখানা বই লিখ্ছেন?"

সরলা বলিলেন:—"নলিনি, সুরেশ বাবু সেই রাত্রে—আমার কাছে তিনি বলেছিলেন—তিনি বিবাহের প্রস্তাব করেছিলেন—কিংবা, করতেন যদি—"

সরলা চুপ করিলেন এবং বসিয়া পড়িলেন—তাঁহার চক্ষু অশ্রুভারাবনত হইল।

"নলিনি, কিছুদিন আগেও আমি মনে করতাম যে আমি তাঁকে ভালবাসি, আর তিনি বলেছিলেন যে তিনি আমাকে ভালবাসেন। কিন্তু সে দিন যখন তিনি বিবাহের কথা বললেন, আমার অত্যন্ত বিরক্তিকর বোধ হল, আর যা বলা উচিত আমি তাই বল্লাম। তার পর থেকে আর তাঁকে দেখি নাই। নারায়ণ রাওএর সভার প্রথম বিশেষ পরিবর্ত্তনের দিন তিনি আমাকে বলেছিলেন।"

নলিনী ধীরে ধীরে বলিলেন—"আমি সুখী হলাম।"

সরলা একটু চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন:—"কেন?"

"কারণ সুরেশ বসুকে আমার কখনও ভাল লাগত না। আমি তাঁকে বিচার করতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু প্রতিজ্ঞা গ্রহণের পর থেকে তাঁর প্রতিজ্ঞা পালন সম্বন্ধে আমার সন্দেহ ছিল।"

সরলা সলজ্জ ভাবে বলিলেন:—"লেখকরূপে তাঁকে আমি প্রশংসা করতাম। বোধ হয়, তিনি যে সময়ে বলেছিলেন সেই সময় ছাড়া অন্য কোন সময় যদি আমার কাছে বলতেন, তা'হলে আমি সহজেই বিশ্বাস করতে পারতাম, যে আমি তাঁকে ভালবাসি। কিন্তু এখন সে ভ্রম গিয়াছে।"

সরলা আবার হঠাৎ থামিলেন; যখন নলিনীর দিকে চাহিলেন, আবার তাঁহার চোখে জল আসিল। নলিনী আসিয়া স্নেহের সহিত তাঁহার গলা ধরিলেন।

সরলা যখন চলিয়া গেলেন, তখন নলিনী—তাঁহার বন্ধু তাঁহার উপর যে বিশ্বাসের পরিচয় দিলেন, সেই বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল, যে সরলার যেন আরও কিছু বলিবার ছিল।

শীঘ্রই সুধীর ফিরিয়া আসিলেন, এবং তিনি ও

নলিনী ঠিক, আগেকার মত হাত ধরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

অবশেষে সরলা তাঁহাদের কথার বিষয় হইলেন. কারণ তাঁহাদের ভবিষ্যৎ কার্য্যের মধ্যে সরলার স্থান অতি সুস্পষ্ট।

"তুমি কি এমন কোন মেয়ে দেখেছ দাদা, যাঁর কণ্ঠস্বর এত সুন্দর, আর যিনি তাঁর জীবন সরলা যে ভাবে কাটাতে যাচ্ছেন সেই ভাবে কাটিয়েছেন? তিনি মন্দিরে গান করেন, জীবিকা অর্জ্জনের জন্য তাঁকে অন্য জায়গায় পড়াতে আর গান শেখাতে হয়, আর তার পর তিনি নারায়ণ রাওএর ওখানে তাঁর শরীর মন ও সঙ্গীতের দ্বারা সাহায্য করতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত।"

সুধীর শুষ্ক ভাবে বলিলেন:—"এটা নিশ্চয়ই আত্ম-ত্যাগের মহৎ দৃষ্টান্ত।"

নলিনী তাঁহার দিকে একটু রুক্ষ ভাবে চাহিলেন।

"কিন্তু তুমি কি মনে কর না যে এটা অসাধারণ দৃষ্টান্ত? তুমি কি মনে করতে পার—" নলিনী ছয় সাত জন বিখ্যাত গায়িকার নাম করিলেন—"এরা এ রকম কোন কাজ করেছে?"

সুধীর সংক্ষেপে বলিলেন:—"না। আমি এও মনে করতে পারিনা যে—"(তিনি নলিনীকে সেই দিন যাহারা সান্ধ্য সমিতিতে লইয়া যাইতে আসিয়াছিল, তাহাদের নাম করিলেন) "এঁরা কেউ তুমি যা করেছ তাই করে-ছেন নলিনি!"

"আমিও মনে করতে পারি না—" (নলিনী সুধীরের দুই এক জন বন্ধুর নাম করিলেন) "এঁরা কেউ তোমার কাজ করছেন, দাদা।"

ঘরের অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তাঁহারা নীরবে বেড়াইলেন।

ফিরিয়া নলিনী বলিলেন:—"সরলার সঙ্গে তুমি এমন ব্যবহার কেন কর দাদা? আমার মনে হয়, তিনি এতে বিরক্ত হন। তুমি আগে ত এ রকম ব্যবহার করতে না! বোধ হয়, তোমার এই পরিবর্ত্তন সরলার ভাল লাগে না।"

সুধীর হঠাৎ থামিলেন। তাঁহাকে অত্যন্ত উত্তেজিত দেখাইল। নলিনীর হাত হইতে তিনি নিজের হাত ছাড়াইয়া লইলেন এবং দ্রুতপদে ঘরের অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একবার বেড়াইয়া লইলেন। তাহার পর ফিরিয়া ভগিনীর নিকট আসিয়া বলিলেন:—

"নলিনি, তুমি কি আমার গোপনীয় বিষয় জান না?" নলিনী বিস্মিত ভাবে তাকাইলেন, তাহার পর তাঁহার মুখের উপর একটি সলজ্জভাব আসিয়া পড়িল।

সুধীর ধীর ভাবে বলিতে লাগিলেন:—"আমি সরলা ছাড়া আর কাউকে ভালবাসি নাই। সেই দিন—যে দিন তিনি থিয়েটারে গান গাইতে যেতে অস্বীকার করেছিলেন—আমি তাঁকে আমার জীবনের সঙ্গিনী হতে অনুরোধ করেছিলাম। তিনি আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। আমি জানতাম তিনি করবেন। তার কারণ তিনি বলেছিলেন, যে আমার জীবনে কোন উদ্দেশ্য ছিল না—তিনি ঠিক বলেছিলেন। এখন আমার জীবনে উদ্দেশ্য আছে, এখন আমি নূতন মানুষ হয়েছি, কিন্তু তুমি কি দেখ্‌ছ না নলিনি, আমার পক্ষে কিছু বলা কিরকম অসম্ভব? আমার নব জীবনের জন্য আমি সরলার সঙ্গীতের কাছে ঋণী। সেই রাত্রে যখন তিনি গান গাইছিলেন—আমি নিঃসঙ্কোচে বল্‌তে পারি—সেই সময়ের জন্য তাঁর কণ্ঠস্বরকে আমি ঈশ্বর-বাণী ছাড়া আর কিছুই মনে করি নাই। আমি বিশ্বাস করি—সেই সময়ের জন্য তাঁর প্রতি আমার ব্যক্তিগত সমস্ত ভালবাসা ঈশ্বরপ্রেমে পরিণত হয়েছিল।"

সুধীর নীরব হইলেন, তাহার পর অধিকতর আবে-গের সহিত বলিলেন:—

"আমি এখনও সরলাকে ভালবাসি। কিন্তু তিনি আমাকে কখনও ভাল বাস্‌তে পারবেন, তা আমি মনে করি না।" তিনি বিমর্ষমুখে একটু হাসি আনিয়া ভগিনীর মুখের দিকে চাহিলেন।

নলিনি মনে মনে অন্যরূপ ভাবিতেছিলেন। তিনি বলিতেছিলেন—"আমি তা মনে করি না।" তিনি সুধীরের মহত্ত্বব্যঞ্জক মুখশ্রী, প্রশস্ত ললাট, বিশাল বক্ষ,

উজ্জ্বল চক্ষু—যাহা তাঁহারই মুখে ন্যস্ত ছিল—এবং বীরত্ব-ব্যঞ্জক, দৃঢ়, সুগঠিত দেহ লক্ষ্য করিতেছিলেন। কেন সরলা তাঁহাকে কোন দিন ভালবাসিবেন না? নিশ্চয় এই দুইজনই দুইজনের উপযুক্ত, বিশেষতঃ এখন তাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য এক হইয়াছে।

তিনি সুধীরকেও এই রকমই কিছু বলিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে বিশেষ সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিলেন না। সেই দিন নলিনী জানিলেন, যে সুধীর ক্লাবে তাঁহার ধনী বন্ধুদের জীবন উন্নততর করিবার জন্য চেষ্টা করিতে যাইতেছেন, এবং সরলার সহিত সাক্ষাতের সুযোগ তিনি আর এখন খোঁজেন না। সুধীর নিজের হৃদয়কে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। নলিনী দেখিলেন যে সরলার প্রতি তাঁহার প্রেম যে পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে ইহা জানিতে দিতে গিয়া পাছে পুনর্ব্বার প্রত্যাখ্যাত হন এই চিন্তাতেই তিনি সঙ্কুচিত হইতেছেন।

যাইবার সময় সুধীর 'দৈনিকের' জন্য কত টাকা দেওয়া হইয়াছে নলিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। নলিনী বলিলেনঃ—"পাঁচ হাজার টাকা।"

অর্থ প্রাপ্তির পরদিন অরবিন্দ বাবু নিজগৃহে বসিয়া এই দানের বিষয় ভাবিতেছিলেন। কে এই টাকা পাঠাইয়াছেন? অনেক চিন্তার পরও তিনি দাতাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলেন না, অবশেষে দাতাকে ধন্যবাদ দিয়া তিনি কার্য্য আরম্ভ করিলেন।

প্রতিজ্ঞাগ্রহণের সেই স্মরণীয় দিনের পর দুই মাস চলিয়া গিয়াছে। বসন্তকাল তাহার মধুর স্নিগ্ধতা লইয়া আবার আসিয়া চলিয়া গিয়াছে এবং কলিকাতাবাসী আবার প্রচণ্ড গ্রীষ্মতাপে দগ্ধ হইতেছেন।

নারায়ণ রাও এবং শ্রীমতী রমা বাই বঙ্গদেশের কার্য্য এ বৎসরের মত সমাপন করিয়া তাঁহাদের মান্দ্রাজবাসী ভাই ভগিনীদের দ্বারে আঘাত করিতেছিলেন। কলিকাতার সেই পাপময় স্থানে কেহ গমন করিলে পূর্ব্বের অবস্থা হইতে তাহার কোন পার্থক্য দেখিতে পাইবেন না, তথাপি সেস্থানে শতজীবনের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। মদের দোকান তখনও সেখানে ছিল এবং নারায়ণ রাও কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত এই সকল হৃদয়ে তাহাদের হৃত অধিকার পুনঃ স্থাপন করিবার জন্য ইহাদিগকে যথাসাধ্য প্রলুব্ধ করিতেছিল। পিশাচ তাহার অধিকার ক্রমে ফিরিয়া পাইতে লাগিল।

আচার্য্য এবার গ্রীষ্মের ছুটীতে স্বাস্থ্যকর কোনও স্থানে গমন করিলেন না। তৎ পরিবর্ত্তে তিনি এমন এক পরিবারের স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন, যাঁহারা সহরের বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু কখনও উপভোগ করেন নাই।

ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য অমরেন্দ্রনাথ সেন তাঁহার জীবনে সেই দিনের কথা কখনও ভুলিবেন না। প্রখর গ্রীষ্মতাপে কলিকাতাবাসী যখন আকুল হইতেছিলেন, সেই রকম একটি দিনে আচার্য্য সেই পরিবারকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিতে ষ্টেশনে গমন করিলেন। তাঁহারা কলিকাতার কোলাহল ছাড়িয়া পল্লীমাতার অনন্ত আকাশতলে সুস্নিগ্ধ, উন্মুক্ত বায়ু উপভোগ করিয়া এক নূতন জীবনের আস্বাদ অনুভব করিতে যাইতেছেন।

মাতার কোলে একটি রুগ্ন শিশু, আরও তিনটি অল্পবয়স্ক সন্তান। তাহাদের পিতা—বৃদ্ধ না হইলেও সাংসারিক দুশ্চিন্তা তাঁহাকে বৃদ্ধ করিয়াছে—সন্তান-গুলিকে লইয়া বসিয়াছিলেন। গাড়ী ছাড়িবার একটু আগে কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য তিনি আচার্য্যের নিকট আসিলেন। কিছু বলিতে না পারিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। সেই অভাবজীর্ণা, পরিশ্রান্তা মাতার তিনটি সন্তানকে গত বৎসর বিষম জ্বর আসিয়া লইয়া গিয়াছে। তিনি সমস্ত পথ জানালার পাশে বসিয়া উপরে নীল আকাশ এবং নীচে হরিৎবর্ণ মাঠ দেখিয়া এক প্রকার আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন। ইহা তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ নূতন।

সেই দিন অসহ্য তাপে ক্লিষ্ট হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়া আচার্য্য মনে যে এক আনন্দ অনুভব করিলেন তাহার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। এই রকম স্বার্থত্যাগ তাঁহার জীবনে এই সর্ব্ব প্রথম।

রবিবার মন্দিরে প্রতিজ্ঞাগ্রহণকারীদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেনঃ—"এবার আমি স্থান পরিবর্ত্তনের কোন

আবশ্যকতা বোধ করলাম না। আমি বেশ ভাল আছি।” সেই অর্থ দ্বারা তিনি কি করিয়াছেন তাহা পত্নী ব্যতীত অপর সকলের নিকট গোপন রাখিতে পারিয়াছেন—ইহা মনে করিয়া তিনি এক প্রকার আরাম অনুভব করিতে লাগিলেন। গোপনে, অপরের অনুমোদন ব্যতীত এইরূপ কাজ করার আবশ্যকতা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

সমস্ত গ্রীষ্মকাল আচার্য্য তাঁহার নিয়মিত কার্য্য করিলেন। এই কয়মাসে কলিকাতায় কত আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে! আচার্য্য এর সকলগুলিতেই ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পাইলেন। মন্দিরে এখনও এমন অনেক লোক ছিলেন যাহারা এই সমস্ত আন্দোলনকে—সরলার মাতার ন্যায়, কেবল মস্তিষ্ক বিকার-প্রসূত বলিয়া মনে করিতেন এবং পূর্ব্বের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিবে বলিয়া অপেক্ষা করিতেন।

আচার্য্য তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে কালী-মোহন বাবুর ‘ভারত ভাণ্ডারে’ দরিদ্র ভাইদের কাছে মাসে মাসে যাইতেন।

শ্রাবণের সন্ধ্যা। দীর্ঘকালব্যাপী অসহ্য উত্তাপের পর একটি স্নিগ্ধ সুশীতল দিন আসিয়াছে। এক পসলা বৃষ্টির পর আকাশ আবার পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। বর্ষাজল-ধৌত গাছপালা ও বাড়ীগুলির উপর সান্ধ্যরবির একটা অস্পষ্ট আরক্তিম আভা আসিয়া পড়িয়াছে। সুরেশচন্দ্র তাঁহার গৃহের জানালায় দাঁড়াইয়া রাস্তার দিকে তাকাইয়া ছিলেন।

টেবিলের উপর কতকগুলি খাতাপত্র, বই ইত্যাদি ছড়ানো ছিল। সেই যে বসন্তকালের একটি জ্যোৎস্না-লোকিত রাত্রিতে তিনি সরলাকে আপন প্রেম জানাইয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলেন, তাহার পর হইতে আর তাঁহার সঙ্গে দেখা হয় নাই। লেখকের অভ্যাস বশতঃ তিনি স্বভাবতঃই নির্জ্জনপ্রিয় ছিলেন, তাহার পর সেই দিনকার সেই আঘাত তাঁহার অভিমানপূর্ণ প্রকৃতিকে আরও নির্জ্জনতার মধ্যে ঠেলিয়া আনিয়াছে।

সমস্ত গ্রীষ্মকালটা তিনি কেবল লিখিয়াছেন। অন্যান্য সকলের সহিত প্রতিজ্ঞা গ্রহণের কথা তিনি ভুলিয়া যান নাই। সরলার নিকট প্রত্যাখ্যাত হইবার পর হইতে তিনি যতবার লিখিতে বসিয়াছেন, সে কথা তাঁহার মনে হইয়াছে। ‘মহাপুরুষেরা কি করিতেন?’ তাঁহারা কি এই গল্প লিখিতেন? এই প্রশ্ন তিনি শতবার করিয়াছেন। এই ধরণের গল্প সাধারণ লোকের কাছে খুব প্রিয় হয়। ইহার কোনও উচ্চলক্ষ্য নাই। ইহার ভিতরে খারাপ কিছু নাই, কিন্তু ভালও কিছু নাই। এই রকম বই খুব বিক্রয় হইবে। সাধারণ লোক কি চায়, কি ভালবাসে তাহা তিনি জানিতেন।

‘মহাপুরুষেরা কি করিতেন?’ এই প্রশ্ন নিতান্ত অসময়ে আসিয়া তাঁহাকে বিড়ম্বিত করিয়া তুলিল। তিনি বড়ই উত্যক্ত হইলেন। লেখকরূপে মহাপুরুষদের আদর্শ বড় বেশী উঁচু। মহাপুরুষেরা অবশ্যই দেশের কল্যাণ, জগতের কল্যাণের উদ্দেশ্য লইয়া লিখিতেন। তিনি—সুরেশচন্দ্র কি উদ্দেশ্য লইয়া এই উপন্যাস লিখিতেছেন?—অর্থ ও যশ। এই নূতন গ্রন্থ যে তিনি এই উদ্দেশ্যেই লিখিতেছেন, তাহা তাঁহার নিজের কাছে গোপন নাই। তাঁহার আর্থিক অভাব ছিল না, সুতরাং অর্থলিপ্সায় তিনি ইহা লিখিতেছিলেন না। কিন্তু লেখকরূপে তাঁহার খ্যাতি চাই-ই। তিনি অবশ্যই ইহা লিখিবেন। কিন্তু ‘মহাপুরুষেরা কি করিতেন?’ সরলার প্রত্যাখ্যান অপেক্ষাও এই প্রশ্ন তাঁহাকে অধিকতর পীড়া দিতে লাগিল। তিনি কি তাঁহার ব্রত ভঙ্গ করিতে যাইতেছেন?

যখন তিনি জানালায় দাঁড়াইয়া ছিলেন, সুধীর রায় তখনই সেই পথ দিয়া ক্লাব হইতে বাড়ী ফিরিতেছিলেন। সুরেশ তাঁহার মহত্ত্বব্যঞ্জক আকৃতি লক্ষ্য করিলেন। ঠিক এই সময় সেই স্থান দিয়া একখানা গাড়ী চলিয়া গেল। গাড়ীর ভিতরে সরলা। সরলা নিশ্চয়ই সুধীরদের বাড়ীতে যাইতেছিলেন।

সুরেশ এই দুই মূর্ত্তি—যতক্ষণ না জনতার মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল লক্ষ্য করিলেন। তাহার পর ফিরিয়া আসিয়া লিখিতে আরম্ভ করিবেন। যখন তাঁহার পুস্তকের শেষ অধ্যায়ের শেষ পৃষ্ঠা লেখা হইয়া গেল, তখন অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। ‘মহাপুরুষেরা কি করিতেন?’

এই রকম গল্পের বঙ্গভাষায় অপ্রতুল নাই। ইহা দ্বারা কাহারও কোন কল্যাণ সাধিত হইবে না, বস্তুতঃ অকল্যাণ হইবে। তাঁহার গল্প লিখিবার শক্তি আছে; তিনি এমন গল্প লেখেন না কেন যাহা দ্বারা দেশের, জগতের কল্যাণ হইতে পারে? এই তুচ্ছ অসার গল্পেতে কি তা হইবে?—না। মহাপুরুষেরা কি ইহা প্রকাশিত করিতেন?

অবশেষে তিনি ধর্ম্মকে অস্বীকার করিয়া এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন। ঘোর অন্ধকার আসিয়া সুরেশের গৃহকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

শ্রীনির্ঝরিণী ঘোষ।

ইংরাজ-বালকের শিক্ষা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কোন কোন বালক প্রথম হইতেই তাহাদের বিদ্যালয়-প্রবাস বেশ সুখের মনে করে, কিন্তু কেহ কেহ প্রথমে অত্যন্ত কষ্ট বোধ করে, গৃহের জন্য তাহাদের মন একান্ত আকুল হইয়া উঠে।

ছোট বড় সকল স্কুলেই নবাগত দিগকে প্রথমে খুব পরীক্ষায় পড়িতে হয়। অনেক দুষ্ট, মায়ের আদুরে ছেলে ইহাতেই বেশ শোধরাইয়া যায়। খেলাধূলা, কীলাকীলি, ঘুষাঘুষি যেন ইংরাজ-বালকদিগের প্রকৃতিগত। নবাগত দিগকে আসিয়াই সহবাসীদিগের সহিত যুদ্ধে তাহাদের বলের পরীক্ষা দিতে হয়। কিন্তু ইহাতে পরস্পরের প্রতি কোন মনোমালিন্য জন্মে না। যুদ্ধের পরেই আবার সখ্য স্থাপিত হয়।

পূর্ব্বে ছোট ছোট বালকদিগকে অপেক্ষাকৃত বয়স্ক বালকদিগের হস্তে নিতান্ত পাশব নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইত। ইদানীং তাহা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে; কিন্তু নবাগত-দিগকে এখনও স্কুলে আসিয়া প্রচুর বেগ পাইতে হয়।

বিদ্যালয়ের বালকেরা পরস্পরের অসাক্ষাতে পরস্পরের নিন্দা করে না, অথবা কাহারও নামে কেহ নালিশ করে না। যদি দুর্ভাগ্যক্রমে কেহ কখন এই নিয়ম ভঙ্গ করে তবে তাহার আর নিস্তার নাই। সকল বালকে মিলিয়া তাহাকে "ছিচ্‌কাঁদুনে", "কাপুরুষ" প্রভৃতি বিশেষণে অভি-হিত করে। সে যে দিকে যায় সকলে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া তাহাকে দেখায়। সুতরাং সে আর দ্বিতীয় বার এরূপ করিতে সাহস পায় না।

বিদ্যালয়ে ইংরাজবালকদিগের খেলা তাহাদিগের চরিত্রগঠনের এক প্রধান উপায়। বৃথা গর্ব্ব, অহঙ্কার সেখানে তিষ্ঠিতে পারে না। যে বালক যে স্থানের উপযুক্ত, তাহার যতটুকু শক্তি তাহার অতিরিক্ত প্রদর্শন করিতে গেলে সঙ্গীরা তাহাকে জব্দ করিয়া ছাড়ে। বর্ত্তমান সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের এক পুত্র বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালে তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ এক সঙ্গীর সহিত বাক্‌বিতণ্ডা করিয়াছিল। রাজকুমার বলিয়া সঙ্গীরা তাঁহাকেও জব্দ করিতে ছাড়ে নাই।

ইংরাজ বালকগণ বুদ্ধিতে ভারতীয় বালকগণ অপেক্ষা হীন না হইলেও পড়াশোনায় তাহাদের মনোযোগ যে এদেশীয় ছাত্রগণ অপেক্ষা অনেক কম তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। খেলা এবং ছুটাছুটিতেই তাহারা অধিকাংশ সময় কাটায়, পড়াশোনা যেন নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই করে। ছুটীর দিনে ত তাহারা পুস্তক স্পর্শই করে না বলিলে চলে। ছুটীর অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই কি খেলা খেলিবে তাহার আয়োজন চলিতে থাকে। ক্রিকেট ও ফুটবল খেলাই বেশী। "শশক ও কুকুর"-খেলায়ও অনেকে মত্ত হয়। একজন "শশক" সাজে এবং প্রথমে দৌড়িতে আরম্ভ করে, পেছনে টুকরা টুকরা কাগজ ছড়াইয়া যায়, যেন যাহারা "কুকুর" হইয়াছে তাহারা বুঝিতে পারে, সে কোন দিকে গিয়াছে। পাহাড়ে, জঙ্গলে, গর্ত্তে, সর্ব্বত্র "কুকুরেরা" "শশককে" খুঁজিয়া বেড়ায়। এই সকল স্বাস্থ্যসম্পন্ন, বৈজ্ঞানিক নিয়মানু-সারে খেলিতে অভ্যস্ত বালকদিগকে যথা তথা এরূপে ছুটিতে দেখিতে কত আনন্দ বোধ হয়। সাধারণ রাস্তায় আমাদের দেশীয় ছাত্রগণ এরূপ ভাবে খেলাকে নিশ্চয়ই অভদ্রতার পরিচায়ক মনে করিবে। কিন্তু আমাদের দেশের ছেলেরা যত দিন শারীরিক উন্নতি সাধনে যথেষ্ট মনোযোগী না হইবে, শারীরিক স্ফূর্ত্তি ও বলবৃদ্ধিকর খেলাধূলায় মন না দিবে তত দিন তাহাদের

প্রকৃত উন্নতি হইবে না। চরিত্রের উন্নতিই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। দেহ সবল না হইলে মন সবল থাকিতে পারে না। মন সবল না হইলে শিক্ষার সকল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়।

ইংলণ্ডে ছোট ছোট বালক বালিকাদিগকেও অভিভাবকগণ প্রতিদিন কয়েক মাইল বেড়াইতে দেন। সাধারণ রৌদ্র, বৃষ্টি, বরফ কিছুতেই তাহাদিগকে বাধা দেয় না। একটু বয়স্ক হইলে ছুটীর দিনে বালকেরা সুন্দর সুন্দর প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক দৃশ্য দেখিবার জন্য এক এক দিনে ১৮।২০ মাইল পর্য্যন্ত ভ্রমণ করে। কখন কখন কয়েক সপ্তাহের জন্য তাহারা ভ্রমণে বাহির হয়। ভ্রমণ ছাড়া নৌকা-চালন, স্কেটিং প্রভৃতি নানা আমোদজনক খেলাও তাহারা প্রায় সর্ব্বদাই খেলে।

শরীরের যাহাতে বিকাশ হয়, শারীরিক শক্তি যাহাতে বর্দ্ধিত হয় তাহার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ না দিলে পরিণামে ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। কারণ শরীর মস্তিষ্ক ও আত্মার যন্ত্র স্বরূপ। বাদ্যযন্ত্র যদি ভগ্ন অথবা অনুপযুক্ত হয় তবে অতি শ্রেষ্ঠ বাদ্যকরও তাহা হইতে সুস্বর নির্গত করিতে পারে না; সেইরূপ মস্তিষ্ক সূক্ষ্ম বুদ্ধিশালী অথবা আত্মা ধর্ম্মের জন্য অত্যন্ত উন্মুখ হইলেও দুর্ব্বল শরীরের জন্য উভয়ই প্রচুর পরিমাণে বাধা প্রাপ্ত হয়।

এদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অপেক্ষাকৃত প্রসার লাভ করিয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ডে ব্যবস্থা অন্যরূপ। অপেক্ষাকৃত অল্প বালকই—এমন কি সম্ভ্রান্ত গৃহেরও অল্প বালক—উপাধি লাভের আশায় বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়। তাহারা কোন শিল্প ও ব্যবহারিক (practical and technical) বিষয়ে সুশিক্ষা লাভ করিয়া বৈজ্ঞানিক অথবা বাণিজ্য বিষয়ক কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হয়। অনেক আভিজাত (aristocracy) বংশের বালক বালিকাগণও এখন ব্যবসায়ের জন্য শিক্ষা লাভ করিতেছে। ইংলণ্ডে নির্দ্দোষ কাজ মাত্রই সম্মানযোগ্য। যে কোন বিষয়ে বিশিষ্ট জ্ঞান লাভ করিলে অর্থ ও সম্মান লাভ হয়। কেরাণীগিরিতে আর অতি সামান্য। ইংলণ্ড কলকারখানার উৎপন্ন দ্রব্য দ্বারা এবং ব্যবসায় বাণিজ্য দ্বারাই এত সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে ভারতবর্ষের এতগুলি যোগ্য সন্তান আইন ব্যবসায়ে নিযুক্ত রহিয়াছেন। তাঁহারা দেশের উৎপন্ন দ্রব্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন না করিয়া দেশের উৎপন্ন অর্থ গ্রহণ করিতেছেন মাত্র। ইঁহাদের অনেকে যদি শিল্প বাণিজ্যের উন্নতিতে মনোযোগী হইতেন, দশের সাহায্যে কলকারখানা স্থাপন করিয়া সামান্য সামান্য উৎপন্ন দ্রব্য হইতে যন্ত্রসাহায্যে মূল্যবান দ্রব্য সকল উৎপন্ন করিতেন তবে দেশের কত শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারিত।

এদেশে কোন কোন ব্যবসায় হীনতাব্যঞ্জক বলিয়া বিবেচিত হয়। আশা করা যায় এই কুসংস্কার দিন দিন দূর হইতেছে। ইংরাজ বালকদিগের শিক্ষার প্রণালী হইতে আমাদের অনেক শিখিবার আছে, ইংরাজের দোষ ত্রুটী বর্জ্জন করিয়া তাহাদের নিকট হইতে যাহা গ্রহণীয় আছে তৎপ্রতি যেন আমরা উপেক্ষা না করি।

লক্ষ্মীবাই।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অতঃপর মহারাণী জব্বলপুরের কমিশনার সাহেবকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "অসন্তুষ্ট সিপাহীরা ঝান্সীর সমস্ত ইংরাজ রাজপুরুষকে হত্যা করাতে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছে; ইংরাজ বাহাদুর কর্তৃক শাসনভার পুনঃগৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত আমি নিজে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিব।"

ইংরাজের শাসন বিলুপ্ত এবং মহারাণীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে দুরাকাঙ্ক্ষ ব্যক্তিগণ (যথা, সদাশিব, দামোদর, নাথ খাঁ) উৎসাহিত হইয়া ঝান্সী অধিকার করিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। লক্ষ্মীবাই সবিশেষ যোগ্যতা সহকারে এই সকল শত্রুর বিষদন্ত ভগ্ন করিয়া ঝান্সী রক্ষা করিলেন।

ঝান্সীর প্রাগুক্ত বিপদ নিবারণ করিয়া মহারাণী শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ জন্য সুবন্দোবস্ত করিলেন এবং পত্র দ্বারা সমস্ত বৃত্তান্ত হামিল্টন সাহেবের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু স্বার্থান্বেষী শত্রুগণের ষড়যন্ত্রে এই পত্র পথিমধ্যেই বিলুপ্ত হইল, ইংরাজ বাহাদুরের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অপরিজ্ঞাত রহিল।



বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

মহারাণী ৯।১০ মাস ঝান্সীর শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। "কি সৈনিক শৃঙ্খলা, কি বিচার কার্য্য, কি শান্তি স্থাপন, প্রত্যেক বিষয়েই তাঁহার অসামান্য ক্ষমতা পরিস্ফুট হয়। যৌবনের পূর্ণ বিকাশে তাঁহার দেহ যেমন সুগঠিত ও সৌন্দর্য্যশালী ছিল, দয়া সৌজন্য প্রভৃতি গুণের সমবায়ে তাঁহার প্রকৃতিও সেইরূপ কমনীয় হইয়াছিল। * * * রাণী প্রতিদিন বেলা তিনটার সময় হইতে প্রায়শঃ পুরুষ বেশে, কখন কখন নারীবেশে সজ্জিত হইয়া দরবারে উপনীত হইতেন। পায় পায়জামা, অঙ্গে বেগুণী রঙ্গের অঙ্গরক্ষা, মাথায় টুপী, তাহার উপর পাঠানী পাগড়ী, সোনার জরির দোপাট্টা, উহাতে লম্বমান রত্নখচিত অসি, তাঁহার এইরূপ পুরুষবেশে তদীয় যৌবনোল্লাসিত গৌরকান্তি অধিকতর রমণীয় হইত। * * তাঁহার বসিবার ঘর দরবার ঘরের সংলগ্ন ছিল। এই গৃহের দ্বারদেশে পর্দ্দা থাকিত। সুতরাং বাহিরের লোক তাঁহাকে দেখিতে পাইত না। তিনি গদির উপর তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া সমীপস্থিত কর্ম্মচারীদিগকে রাজ্যশাসন সম্বন্ধে যথাযোগ্য আদেশ দিতেন। কখন কখন আদেশলিপি তৎকর্তৃক লিপিবদ্ধ হইত। তাঁহার রাজ্যশাসনে যেরূপ ক্ষমতা, সেইরূপ দেব-ভক্তি, আশ্রিত-জন প্রতিপালন প্রভৃতি এবং দীন দুঃখীর প্রতি দয়া ছিল। তিনি আপনার আহত সৈনিকদিগের চিকিৎসাকালে অশ্রুপূর্ণলোচনে তাহাদের পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিতেন, স্নেহময়ী জননীর ন্যায় তাহাদের গায় হাত বুলাইতেন, প্রশংসাবাদে তাহাদের কষ্টের লাঘব করিতেন, এইরূপ সদয়ভাব, এইরূপ স্নিগ্ধ ব্যবহারে, এইরূপ প্রীতিময় কোমলতায় তিনি প্রজালোকের মাতা ছিলেন। তাঁহার সভায় নানাদেশের গুণিজনের সমাগম হইত। (১)

প্রাগুক্ত ভাবে লক্ষ্মীবাই কর্তৃক ঝান্সীর শাসনকার্য্য ৯।১০ মাস কাল সুসম্পাদিত হইবার পর প্রধান ইংরাজ সেনাপতি সার হিউ রোজ উত্তর ভারতের নানা স্থানের বিদ্রোহ দমন করিয়া ১৮৫৮ অব্দের ২০শে মার্চ্চ তারিখে ঝান্সীতে আসিয়া পৌঁছিলেন। বীররমণী লক্ষ্মীবাই ইংরাজ সৈন্যের আগমন সংবাদ শ্রবণে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন। "কেহ কেহ বলেন, এই সময় ইংরাজ পক্ষ হইতে সংবাদ আইসে যে, রাণী অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেওয়ান প্রভৃতি মন্ত্রীবর্গকে লইয়া ইংরাজের শিবিরে উপস্থিত হইলে, ইংরাজেরা তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিবেন। এই কথা রাণীর মনঃপুত হয় নাই, তাহাতেই যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, ইংরাজেরা সংকল্প করিয়াছিলেন, রাণী শিবিরে গেলে তাঁহারা তাঁহাকে বন্দী করিবেন, এই জনরব প্রচারিত হওয়াতে রাণী যুদ্ধে উদ্যত হন। আবার কেহ কেহ বলেন, রাণী ইংরাজ-দিগের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া দূত পাঠাইয়াছিলেন, ইংরাজেরা তাহার ফাঁসি দিয়াছিল বলিয়া যুদ্ধ ঘটে।" (১) ফলতঃ লক্ষ্মীবাই কিজন্য ইংরাজ বাহাদুরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, তিনি ঝান্সীস্থিত ইংরাজের বিপদকালে যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন, তার পর তাঁহাদের হত্যাকাণ্ড সাধিত হইলে প্রিয়তম ঝান্সীকে অরাজকতার হস্ত হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে ইংরাজ বাহাদুর কর্তৃক পুনঃ শাসনের বন্দোবস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত স্বয়ং শাসনভার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; এই সকল বিবরণ তিনি ইংরাজ কর্তৃপক্ষকে পরিজ্ঞাত করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াও স্বার্থান্বেষী শত্রুগণের ষড়যন্ত্রে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই; এক্ষণে ইংরাজসৈন্য সমাগত দেখিয়া তিনি আপন সদভিপ্রায়ের বিষয় তাহাদের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া যুদ্ধ নিবারণ রাখা অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা করিলেন এবং তজ্জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

যাহা হউক, অসাধারণ প্রতিভাশালিনী লক্ষ্মীবাই যুদ্ধের জন্য কৃতসংকল্প হইয়া যুদ্ধায়োজন সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় নিজে তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন এবং বহুসংখ্যক দাস দাসীর সহায়তায় এক রাত্রিতেই কামানাদি যুদ্ধোপকরণে দুর্গ সুসজ্জিত করিয়া তুলিলেন। ইংরাজ সৈন্য ঘোর বিক্রমে ঝান্সী অবরোধ করিয়া অগ্নিময় গোলা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। এই ভাবে একাদিক্রমে একাদশ দিবস যুদ্ধ হইল। লক্ষ্মীবাইয়ের দুর্জ্জয় পরাক্রমের নিকট

(১) সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস।

(১) সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস।

ইংরাজ সৈন্যের সমস্ত বীরত্ব ব্যর্থ হইয়া পড়িল। ইংরাজ সেনানীগণ জয়াশায় সন্দিহান হইয়া উঠিলেন। এই সময় সিপাহী বিদ্রোহের প্রধান নায়ক নানা সাহেবের সেনাপতি তাত্যাতোপে বিংশতি সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে ঝান্সীর অদূরে আগমন করিয়াছিলেন। ইংরাজ সেনাপতি এই সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহার দমন জন্য এক দল সৈন্য পাঠাইলেন। তাত্যাতোপে নানা স্থানের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বিজয় গৌরবে দৃপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই অহঙ্কার সর্ব্বনাশের কারণ হইল। এবার তাত্যাতোপে রণক্ষেত্রে ইংরাজের হস্তে পরাজিত হইলেন। সিপাহীরা যুদ্ধোপকরণ সমূহ রণক্ষেত্রে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল। এই সংবাদ ঝান্সীতে উপস্থিত হইলে লক্ষ্মীবাইয়ের সৈন্যদলে নিরাশার সঞ্চার হইল। বীররমণী লক্ষ্মীবাই শত্রুর নব বল দর্শনে ভীত না হইয়া অবিচলিত চিত্তে অসম সাহসে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে রাণীর সমস্ত আয়োজন উদ্যোগ ব্যর্থ হইল, দুর্গাজী ঠাকুর নামক এক জন সেনাপতি বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক ঝান্সীর দক্ষিণ দ্বার ইংরাজ সৈন্যের নিকট উদ্ঘাটন করিয়া দিলেন। অতঃপর সহজেই লক্ষ্মীবাইয়ের পরাজয় ঘটিল, বিজয়লক্ষ্মী ইংরাজের অঙ্কশায়িনী হইলেন।

লক্ষ্মীবাই ইংরাজের হস্তে পরাজিত হইয়া স্বীয় পৃষ্ঠদেশে রাজকুমারকে এক খানি শালের দ্বারা বন্ধন করিয়া পুরুষোচিত যোদ্ধৃবেশে অশ্বারোহণে ঝান্সী পরিত্যাগ করিলেন। "ঝান্সী পরিত্যাগের পর রাণী মহোদয়া ঝান্সীতে উপস্থিত হইয়া বিদ্রোহী সিপাহীদিগের সহিত মিলিত হইলেন। অতঃপর তিনি অসীম শৌর্য্য প্রকাশ করিয়া গোয়ালিয়র নগর লুণ্ঠন ও দুর্গ অধিকার করিলেন। ইংরাজেরা গোয়ালিয়র উদ্ধার করিবার জন্য যে যুদ্ধ করেন, তাহাতেই এই বীর-মহিলার অলোকসামান্য সমরনৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছিল। তাহা দর্শনে বিস্মিত হইয়া সার হিউ রোজ তাঁহাকে শত্রুপক্ষের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং ডাক্তার লো তাঁহাকে বিদ্রোহীদলের নেতাদিগের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বাপেক্ষা সাহসসম্পন্ন বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গোয়ালিয়রের যুদ্ধে বিদ্রোহী সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়নপর হইলে রাণী অল্পসংখ্যক অনুচর সহ সমরক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিলেন। কতিপয় ইংরাজ সৈনিক তাঁহার অনুসরণ করিল। আত্মরক্ষার আশা বিলীনপ্রায় হওয়ায় রামচন্দ্র রাও দেশমুখ নামক একজন বিশ্বস্ত সর্দারের প্রতি স্বীয় প্রিয়তম পুত্রের রক্ষণের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। কিয়দ্দূর গমনের পর তিনি এক দল ইংরাজ সৈনিকের দ্বারা আক্রান্ত হইলেন। তখন উভয় পক্ষে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে এক জন শ্বেতাঙ্গ সৈনিক লক্ষ্মীবাইয়ের শীর্ষদেশে অস্ত্রাঘাত ও বক্ষে সঙ্গীন বিদ্ধ করিল। সাংঘাতিক ভাবে আহত হইয়াও বীররমণী অতুল বিক্রমে আততায়ীর প্রাণ বধ করিলেন। তাঁহাকে শত্রুপক্ষের সৈনিকের ভীষণ খড়্গাঘাতে কাতর দেখিয়া রামচন্দ্র রাও নিকটবর্ত্তী এক পর্ণকুটীরে লইয়া গেলেন। পিপাসায় রাণীর কণ্ঠ শুষ্ক হইতেছিল। কুটীরস্বামী গঙ্গাদাস বাবাজী তাঁহাকে প্রচুর পরিমাণে গঙ্গাজল পান করাইলেন। সুশীতল গঙ্গাজল পানে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া রাণী স্নেহপূর্ণ নয়নে রাজকুমার দামোদরের প্রতি একবার সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার নেত্রদ্বয় চিরকালের জন্য দীপ্তিহীন হইল, তাঁহার অমর আত্মা অমর ধামে চলিয়া গেল। (১)

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান।

ওরে বাছা! মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?—শ্রীমধুসূদন।

শ্রদ্ধেয় শশধর রায় মহাশয় যখন আপনাদের প্রতিনিধি স্বরূপ আমার নিকট উপস্থিত হইয়া সাহিত্য সম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিলেন তখন আমি যুগপৎ বিস্ময় ও আতঙ্কে অভিভূত হইলাম। প্রথমতঃ মনে হইল, নাম বা ঠিকানা ভুলিয়া হয় ত তাঁহারা আমার নিকট আসিয়াছেন। আমি সাহিত্যসেবা করি নাই। বলিতে লজ্জা হয়, মাতৃভাষায় দুইটি কথা সংযোগ করিতে হইলে আমার হৃদয়ে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ যে আসনে সাহিত্যরথী রবীন্দ্রনাথকে আপনারা একবার প্রতিষ্ঠিত

(১) ঝান্সীর রাজকুমার।

করিয়াছিলেন, সে আসন গ্রহণ করা আমার ধৃষ্টতা ও বাতুলতা মাত্র। তার পর আমি এক প্রকার চিররুগ্ন। দূর প্রদেশে আসিয়া কোন প্রকার শ্রমসাধ্য কাজ করা আমার শক্তি ও সামর্থ্যের অতীত। এই সকল কারণ প্রদর্শন করিয়া আমি এই সম্মান প্রত্যাখ্যান করি। কিন্তু শশধর বাবু যখন পরদিন সাহিত্য-পরিষদের দুই প্রধান স্তম্ভস্বরূপ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়দ্বয়কে সঙ্গে করিয়া পুনরায় এই ক্ষুদ্র ও ক্ষীণদেহ মশককে ধৃত করিবার জন্য জাল বিস্তার করিলেন, তখন পরাভূত হইয়া আত্ম-সমর্পণ করাই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিলাম। আমি এক প্রকার বন্দীভাবে আপনাদের সমক্ষে আনীত, এই গুরুভার আমার স্কন্ধে চাপাইয়া আপনারা কতদূর সফলতা লাভ করিবেন জানি না, তবে "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" এই শাস্ত্রোক্ত বচনের উপর নির্ভর করিয়া আজ সম্মিলনের কার্য্য আরম্ভ করিতেছি।

স্থানীয় কমিটির নির্দ্দেশ অনুসারে বঙ্গসাহিত্যে কি কি উপায় অবলম্বন করিলে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের প্রসার হইতে পারে তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক্।

জাতীয় সাহিত্য জাতির মানসিক অবস্থা-পরিচায়ক ও পরিমাপক। যে কোন দেশের কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের সাহিত্য নিবিষ্টভাবে পর্য্যালোচনা করিলে সে দেশের তৎকালীন লৌকিক চরিত্র সম্বন্ধে প্রভূত অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। কারণ, সাহিত্য জাতীয় চরিত্র ও প্রবৃত্তির শাব্দিক বিকাশ মাত্র। যেমন চিত্রকর নীরব ভাষাতে চিত্রিত বিষয়ে কেমন এক প্রকার সজীবতা প্রদান করেন যদ্দ্বারা আলেখ্যবিশেষের মনোগত ভাব অনায়াসেই উপলব্ধি করা যায় তেমনি সাহিত্য-চিত্রে জাতীয় চরিত্র মুখরিত হয়। বাঙ্গালা সাহিত্যের সূচনা হইতেই তাহাতে ধর্ম্মপ্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। মানিকচাঁদ ও গোবিন্দচন্দ্রের গীতাবলী হইতে আরম্ভ করিয়া রামপ্রসাদের শ্যামাসংগীত ও ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল পর্য্যন্ত কেবল এই একই সুর। এই ভাবের চরম বিকাশ হইয়াছে বৈষ্ণব সাহিত্যে। প্রেমের জয়, নামে রুচি, যে সাহিত্যের মূলমন্ত্র সেই বৈষ্ণব সাহিত্যের উন্মাদন স্রোতে দেখিতে পাই সেই একভাব—ধর্ম্মপ্রবণতা। এই বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রসাদেই আমরা আজ বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের বীণা-নিক্কণ শুনিয়া মাতৃভাষাকে ও স্বদেশকে গৌরবান্বিত মনে করি। চণ্ডীদাস তাঁহার প্রেম সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাঁহার পদাবলী সম্বন্ধেও সেই উক্তি প্রয়োগ করিব। ইহার আদ্যোপান্ত "নিকষিত হেম।"

এই ধর্ম্ম-সাহিত্যের স্রোত মানিকচাঁদের সময় অর্থাৎ খৃঃ একাদশ শতাব্দী হইতে প্রবাহিত হইয়া বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি, পুষ্টি সাধন ও কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। সেই স্রোত আজও প্রবাহিত। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের গুরুস্থানীয় (inspirer) জয়দেবের সময় হইতে কৃষ্ণকমল গোস্বামী—এই সাত শত বৎসর—একই প্রসঙ্গ চলিতেছে। গীতগোবিন্দে যে তরঙ্গ আলোড়িত, "রাই উন্মাদিনীতে" ও তাহারি আঘাত ও প্রতিঘাত দেখিতে পাই। এই সংক্রামকতা ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী কবিগণও এড়াইতে পারেন নাই। বৈষ্ণব পদাবলীতে ১০।১৫ জন মুসলমান কবির পদাবলী পাওয়া যায়। গত কয় বৎসর বাঙ্গালা ভাষায় যত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে অধিকাংশই ধর্ম্ম-বিষয়ক।

বাঙ্গালা সাহিত্যে কোন্ সময়ে গদ্যের প্রথম আবির্ভাব হয় তাহার আলোচনা করিবার আমাদের সময় নাই। তবে মোটামুটি ইহা ধরা যাইতে পারে যে গদ্য সাহিত্যের বয়স শতবর্ষ মাত্র। ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজ স্থাপন সময় হইতে বঙ্গ সাহিত্য নবযুগে পদার্পণ করিয়াছে। কেরী, মার্স্‌ম্যান, ওয়ার্ড প্রমুখ শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ, রাজীবলোচন এবং মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার, রাম রাম বসু, রামমোহন রায় প্রভৃতি মহাত্মাগণ এই যুগের প্রবর্ত্তক। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-লেখক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ইংরেজ-প্রভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইতিহাস সবিস্তার বিবৃত করিয়া, নিম্নলিখিত কথা কয়টী বলিয়া তাঁহার সারবান গ্রন্থের উপসংহার করিয়াছেন :—

"ইংরেজ আগমনের সঙ্গে সামাজিক জীবনে, রাজনৈতিক জীবনে, নূতন চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে; নূতন আদর্শ, নূতন উন্নতি, নূতন আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সমস্ত

জাতি অভ্যুত্থান করিয়াছে। সাহিত্যে এই নবভাবের ফলে গদ্য সাহিত্যের অপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে, বাঙ্গালী এখন বাঙ্গালা ভাষাকে মান্য করিতে শিখিতেছে, এ বড় শুভ লক্ষণ। ক্রীড়াশীল শিশু যেমন সমুদ্রতীরে খেলা করিতে করিতে একান্ত মনে গভীর উর্ম্মিরাশির অস্ফুট ধ্বনি শুনিয়া চমকিত হয়, এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রসঙ্গে ব্যাপৃত থাকিয়া আমিও সেইরূপ বঙ্গসাহিত্যের অদূরবর্ত্তী উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির কথা কল্পনা করিয়া বিস্মিত ও প্রীত হইয়াছি। অর্দ্ধ শতাব্দীতে বঙ্গীয় গদ্য যেরূপ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাতে কাহার মনে ভাবী উন্নতির উচ্চ আশা অঙ্কুরিত না হয়!"

আজ আমাদের সাহিত্য সমৃদ্ধিশালী। রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে যে বীজ অঙ্কুরিত হয়, প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অসামান্য প্রতিভা-প্রভাবে তাহার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে। এমন কি বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যকে অনেকে বিদ্যাসাগরীয় যুগের সাহিত্য এই আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালা সাহিত্যের শব্দবিন্যাস বর্ত্তমান হইতে অনেকটা বিভিন্ন। তাঁহার বেতাল পঞ্চবিংশতি সংস্কৃত সমাসবদ্ধ পদে পরিপূর্ণ। এক পংক্তি রচনার মধ্যে ৩।৪টি দুরূহ সমাসবদ্ধ পদের অস্তিত্ব বর্ত্তমান পাঠকদিগের নিকট কিরূপ সুখপাঠ্য হইবে তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের শৈশবে ইহাই রীতি ছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তক "প্রবোধ-চন্দ্রিকা" তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। "কোকিলকলালাপ বাচাল যে মলয়াচলানিল সে উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছ নির্ঝরাম্ভঃ কণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে" ইহাই তখনকার আদর্শ ভাষা ছিল! এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র "আলালের ঘরের দুলাল"এর মুখবন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপকেরা ঘিকে "আজ্য" বলিতেন, কদাচ 'ঘৃতে' নামিতেন। খইকে "লাজ", চিনিকে "শর্করা" ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া ভাষায় সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করিতেছিলেন। যাহা হউক নূতন বন্যায় সে ঢেউ চলিয়া গেল। বসন্তের অতৃপ্ত কোকিল বঙ্কিম-চন্দ্রের লেখনীতে যেমন একদিকে বিরহের উচ্ছ্বাস-গীতিকা গাহিতে লাগিল, আবার 'আনন্দমঠে' স্বদেশপ্রেমিকতার ভৈরবনিনাদ, অপরদিকে সংযম, আত্মনিবৃত্তি, যোগ, অনুশীলন, সুখ, দুঃখ ইত্যাদির উচ্ছ্বাসে 'বঙ্গদর্শন' বঙ্গদেশে নূতন যুগ আনয়ন করিল। সেই অলোকসামান্য প্রতিভায় উদ্ভাসিত হইয়া আজ বাঙ্গালা সাহিত্য সমগ্র ভারত-সাহিত্যের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অক্ষয়-কুমার, দীনবন্ধু, কালীপ্রসন্ন, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি এই ক্ষেত্রে নিজ নিজ প্রতিভাবারি সিঞ্চন করিয়া উর্ব্বরতা সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন। ঈশ্বর গুপ্ত, শ্রীমধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এই সাহিত্যের কাব্যাংশ কনকাভরণে সাজাইয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। কিন্তু এ সমস্ত সত্বেও আজ আমাদের সম্মুখে একটী ভীষণ বিপদ উপস্থিত। আমাদের সাহিত্যের আংশিক উন্নতি হইয়াছে মাত্র, সাহিত্যের উপন্যাস ও কাব্যাংশের পূর্ণ বিকাশ হইতেছে ইহাও সত্য বটে, কিন্তু একটী কারণে ভাষার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইতে পারিতেছে না। শারীর-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, যে অঙ্গের চালনা হয় সেই অঙ্গ দৃঢ় ও সবল হইতে থাকে আবার যে অঙ্গের চালনা হয় না তাহা ক্ষীণ হইতেও ক্ষীণতর হইয়া পরে একেবারে নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। আমাদিগের সাহিত্যে বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তকের বড়ই অভাব।

প্রাচীন ভারতে সত্যের ও নূতন তত্ত্বের অনুসন্ধানের জন্য ঋষিরা ব্যস্ত থাকিতেন। কিন্তু মধ্যযুগে এ সমস্ত লুপ্ত হইল। চৌষট্টি কলার অন্তর্ভুক্ত যিনি যত বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিতেন, তিনি শিক্ষিত সমাজে তত জ্ঞানবান বলিয়া আদৃত হইতেন। বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র' অতি প্রাচীন গ্রন্থ। উক্ত গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, ধাতুবাদ, (Chemistry and Metallurgy) ঐ সকল কলার মধ্যে পরিগণিত হইত। চরকে বনৌষধি চিনিয়া ও বাছিয়া লইবার জন্য উদ্ভিদ্ বিদ্যালাভের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শিত হইয়াছে এবং সুশ্রুতে শবব্যবচ্ছেদ করিয়া অস্থি-বিদ্যা শিখিবার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের মধ্যে শল্যতন্ত্র (Surgery) একটী প্রধান অঙ্গ। সুশ্রুতে যে ক্ষারপাকবিধি বর্ণিত আছে, তাহা নব্য রসায়ন শাস্ত্রের এক অধ্যায় বলিয়া অবিকৃত ভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু হায়, যে ভারতের পূর্ব্বকালীন ঋষিগণ

জ্ঞানে ও ধর্ম্মে বর্ত্তমান জগতেরও আদর্শ, যাঁহাদের কাব্য ও দর্শন আজও সভ্য জগতের সাহিত্য মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে, যে সাম গান একদিন ভারতের বন ভবনে উচ্চারিত ও গীত হইয়া ভারতে ধর্ম্মের যুগ আনয়ন করিয়াছিল, যে তটশালিনী গঙ্গাযমুনা আবহমানকাল হইতে কুলুকুলু নিনাদে বহিয়া, বক্ষে প্রাচীন ইতিহাস ধারণ করিয়া আজও হিন্দুস্থান পবিত্র করিয়া সাগর সঙ্গমে ধাইতেছে, সেই ভারতের, সেই পুণ্যদেশ আর্য্যাবর্ত্তের জ্ঞানরবি, দুর্ভাগা বংশধর আমাদিগের দোষে অস্তমিত হইল! সত্যই কবি গাহিয়াছেন :—

"অবসাদ হিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে"
"তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে।"

অনুসন্ধিৎসা তিরোহিত হইল, ঔষধ সংগ্রহের জন্য উদ্ভিদ্ পরিচয়ের ভার বেদিয়া জাতির উপর সমর্পিত হইল। অস্ত্রচালনার দুঃসাধ্য ভার নরসুন্দরের উপর ন্যস্ত হইল। যাহা হউক, অতীতের আলোচনা ও অনুশোচনায় প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন নাই, এখন সময় আসিয়াছে।

গত কয় বৎসর বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার প্রায় সমস্ত গুলিই পাঠ্যপুস্তকশ্রেণীভুক্ত। দুই একখানি মাত্র সাধারণ পাঠোপযোগী। ইহা আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্য হইতে বিজ্ঞান স্থানচ্যুত হইয়াছে! বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া ইউরোপখণ্ডে ও আসিয়ার পূর্ব্ব প্রান্তে আশ্রয় লইয়াছেন। বাস্তবিক ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গালা সাহিত্যের এ প্রকার দুর্গতি হয় নাই। বাঙ্গালা সাময়িক পত্রিকায় তখন বিজ্ঞান স্বীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল। অক্ষয়কুমার "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়" পদার্থবিদ্যা বিষয়ক যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, রাজেন্দ্রলাল "বিবিধার্থ সংগ্রহে" ভূতত্ত্ব, প্রাণিবিদ্যা ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের অস্থিমজ্জাগত হইয়া থাকিবে। বাঙ্গালা সাহিত্যে বিজ্ঞানের যাহা কিছু সমাবেশ হইয়াছে তজ্জন্য এই দুই মহাত্মার নিকট আমরা চিরঋণী থাকিব। ইঁহাদের কিছু পূর্ব্বে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় লর্ড হর্ডিঞ্জের, আনুকূল্যে Encyclopædia Bengalensis অথবা "বিদ্যাকল্পদ্রুম" আখ্যা দিয়া কয়েক খণ্ড পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। ইহাতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শনতত্ত্ব সকল প্রকাশিত হইত। রাজেন্দ্রলাল ও কৃষ্ণমোহন উভয়েই অশেষশাস্ত্রবিৎ ও নানা ভাষাভিজ্ঞ ছিলেন। যদিও তাঁহাদের রচনা অক্ষয়কুমারের রচনার ন্যায় স্থায়ী প্রচলিত সাহিত্যের (classics) মধ্যে গণ্য হইবে না তথাপি তাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের অভিনব পথপ্রদর্শক বলিয়া চিরকাল মান্য হইবেন! কিন্তু ইঁহাদের পূর্ব্বেও বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসারের জন্য বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইয়াছিল। শ্রীরামপুরের মিশনারীগণকে বর্ত্তমান বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের জন্মদাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; তাঁহারাই আবার বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারেরও প্রথম প্রবর্ত্তক। আমাদের জাতীয় অভিমান আঘাতপ্রাপ্ত হয় বলিয়া একথা আমাদের ভুলিয়া যাইলে, 'খৃষ্টানী বাঙ্গালা' বলিয়া তাঁহাদের কৃত কার্য্যকে উড়াইয়া দিলে চলিবে না। ঐতিহাসিক ন্যায়ের ও সত্যের তুলাদণ্ড হস্তে করিয়া যাহার যে সম্মান প্রাপ্য তাহাকে তাহা প্রদান করিবেন।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম ইয়েটস্ প্রথমে 'পদার্থবিদ্যাসার' বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত করেন। ইহাতে পদার্থ বিদ্যা ভিন্ন মৎস্য, পতঙ্গ, পক্ষী ও অন্যান্য জীবের বর্ণনা আছে। এতদ্ভিন্ন "কিমিয়া বিদ্যাসার" নামক রসায়ন বিদ্যা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ শ্রীরামপুর হইতে প্রচারিত হয়। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় এই পুস্তকের সবিস্তার সমালোচনা করিয়াছেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ 'সমাচার দর্পণ' নামে সর্ব্ব প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশিত করেন, এবং তাঁহারাই আবার 'দিগ্দর্শন' নামক নানা তত্ত্ব বিষয়িনী পত্রিকা পরিচালিত করিতেন। এই পত্রিকাতেই বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চ্চার প্রথম সূত্রপাত হয়।

ইহার পর ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে "বিজ্ঞান অনুবাদ সমিতি" (Society for translating European Sciences) নামে একটী সমিতি স্থাপিত হয়। প্রফেসর উইলসন এই সমিতির সভাপতি নিযুক্ত হন, এবং উক্ত সমিতির

চেষ্টার "বিজ্ঞানসেবধি" নামক গ্রন্থের ১৫ খণ্ড প্রকাশিত হয়। ইহার পর ১৮৫১ খৃঃ অঃ বার্ণেকুলার লিটারেরী সোসাইটী নামে আর এক সমিতি স্থাপিত হয়। বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসার এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও, যাহাতে বাঙ্গালীর অন্তঃপুরে জ্ঞানালোক প্রবেশ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে ইহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। মহাত্মা বেথুন ও বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এই সভার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; এতদ্ভিন্ন গবর্ণমেণ্ট মাসিক ১৫০৲ চাঁদা দিয়া ইহার আমুকূল্য করিতেন। এই সভার উদ্যোগেই ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র "বিবিধার্থ সংগ্রহ" প্রকাশ করেন। মহামতি হড্‌সন প্র্যাট এই সমিতির স্থাপয়িতাদিগের মধ্যে অন্যতম উদ্যোগী সভ্য ছিলেন। তিনি উক্ত সমিতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে-যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই :—

"বাঙ্গালার অধিবাসীদিগকে ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা দিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাদিতে ব্যুৎপন্ন করার আশা একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং জাতীয় ভাষায় ইহাদিগের শিক্ষার পথ প্রসরতর করা কর্ত্তব্য। এই নিমিত্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন করা একান্ত প্রয়োজনীয়। * * ইহাদের নিমিত্ত সরল সুখপাঠ্য গ্রন্থ প্রচার করিয়া পাঠলিপ্‌সার সৃষ্টি করিতে হইবে। জ্ঞানার্জ্জনের নিমিত্ত তৃষ্ণা বৃদ্ধি করিতে হইবে, নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে অল্প মূল্যের গ্রন্থ প্রচার করিতে হইবে। সেই সকল গ্রন্থে বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও মানব-শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় সহজ ও চিত্তাকর্ষী প্রবন্ধ থাকিবে। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধেও প্রবন্ধাদি লিখিয়া প্রচার করিতে হইবে। নীতি প্রভৃতি উপদেশ-সূচক গ্রন্থ প্রচারও অতি প্রয়োজনীয়, ইহাতে সমাজের যথেষ্ট উন্নতি হইবে। এই সকল প্রয়োজনসাধনের নিমিত্ত সহজ ও সরল সাহিত্য প্রচার অতি আবশ্যক। এই সমিতিকে এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে হইবে।"

বিজ্ঞান-প্রচার সম্বন্ধে এই সমিতির আশা তাদৃশী ফলবতী হয় নাই। ১৭খানি পুস্তক-প্রকাশের পর সমিতি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, গল্প ও আমোদজনক পুস্তকই এ দেশের পাঠকসাধারণের অধিকতর প্রিয়। এতদ্‌ব্যতীত অপর শ্রেণীর পুস্তক আদৌ আদরে গৃহীত হয় না।

এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করা উচিত যে, কলিকাতা, হুগলী ও ঢাকা, এই তিন স্থানে তিনটি নর্ম্মাল বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের ব্যবহারার্থ পদার্থবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, জ্যামিতি, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ক অনেকগুলি বাঙ্গালা পুস্তক প্রণীত হয়। ইহা ভিন্ন ছাত্রবৃত্তি ও মাইনর পরীক্ষার উপযোগী পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা বিষয়ক অনেক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। মেডিক্যাল স্কুলসমূহের পাঠ্য অস্থিবিদ্যা, শরীরবিদ্যা, রসায়নবিদ্যাঘটিত অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থও বাঙ্গালা ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ-প্রচারেও যে বাঙ্গালা ভাষার অনেকটা উন্নতি হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

এখন আলোচনার বিষয় এই যে, অর্দ্ধশতাব্দীর অধিককাল ধরিয়া বাঙ্গালা ভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ সকল প্রচারিত হইতেছে, কিন্তু ইহাতে বিশেষ কিছু ফললাভ হইয়াছে কি না? বিজ্ঞানবিষয়ক যে সকল পুস্তকের কিছু কাট্‌তি আছে, তাহা টেক্‌ষ্টবুক কমিটির নির্ব্বাচিত তালিকাভুক্ত, সুতরাং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সোপানস্বরূপ। একাদশ বা দ্বাদশবর্ষীয় বালকদিগের গলাধঃকরণের জন্য যে সকল বিজ্ঞানপাঠ প্রচারিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা প্রকৃতপ্রস্তাবে দেশের ইষ্ট কি অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, তাহা সঠিক বলা যায় না। আসল কথা এই, আমাদের দেশ হইতে প্রকৃত জ্ঞানস্পৃহা চলিয়া গিয়াছে। জ্ঞানের প্রতি একটা আন্তরিক টান না থাকিলে কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের ২।৩ টি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় বিশেষ ফললাভ হয় না। এই জ্ঞান-স্পৃহার অভাবেই যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত বিদ্যালয় সমূহে বহুকাল হইতে বিজ্ঞান অধ্যাপনার ব্যবস্থা হইয়াছে, তথাপি বিজ্ঞানের প্রতি আন্তরিক অনুরাগসম্পন্ন ব্যুৎপন্ন ছাত্র আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না; কেন না, ইংরাজিতে একটি কথা আছে, ঘোড়াকে জলাশয়ের নিকট আনিলে কি হইবে? উহার যে তৃষ্ণা নাই! এক্-

জামিন পাশই যেখানকার ছাত্রজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য সেখানকার যুবকগণের দ্বারা অধীত বৈজ্ঞানিক বিদ্যার শাখা প্রশাখাদির উন্নতি হইবে, এরূপ প্রত্যাশা করা নিতান্তই বৃথা। সেই সকল মৃতকল্প, স্বাস্থ্যবিহীন যুবকগণের যত্নে জাতীয় ভাষার উন্নতি-বিধান, কিংবা যে কোনও প্রকার দুরূহ ও অধ্যবসায়মূলক কার্য্যের সাফল্যসম্পাদনের আশা নিতান্তই সুদূরপরাহত। বস্তুতঃ এক্‌জামিন পাশ করিবার নিমিত্ত এরূপ হাস্যোদ্দীপক উন্মত্ততা পৃথিবীর অন্য কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। পাশ করিয়া সরস্বতীর নিকট চিরবিদায়গ্রহণ,—শিক্ষিতের এরূপ জঘন্য প্রবৃত্তি আর কোনও দেশেই নাই। আমরা এ দেশে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া জ্ঞানী ও গুণী হইয়াছি বলিয়া আত্মাদরে স্ফীত হই, অপরাপর দেশে সেই সময়েই প্রকৃত জ্ঞানচর্চ্চার কাল আরম্ভ হয়। কারণ, সে সকল দেশের লোকের জ্ঞানের প্রতি যথার্থ অনুরাগ আছে; তাঁহারা এ কথা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার হইতে বাহির হইয়াই জ্ঞানসমুদ্র-মন্থনের প্রশস্ত সময়। আমরা দ্বারকেই গৃহ বলিয়া মনে করিয়াছি, সুতরাং জ্ঞান-মন্দিরের দ্বারেই অবস্থান করি, অভ্যন্তরস্থ রত্নরাজি দৃষ্টিগোচর না করিয়াই ক্ষুণ্ণমনে প্রত্যাবর্ত্তন করি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক-পঞ্জিকা পরীক্ষোত্তীর্ণগণের নামে পরিপূর্ণ দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। এক বৎসর হয় ত উদ্ভিদবিদ্যায় ১০ জন প্রথম শ্রেণীতে এম্. এ. পাশ হইলেন। কিন্তু অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এখানেই নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইল; সে সমুদয় যুবককে ২।১ বৎসর পরে আর বিদ্যামন্দিরের প্রাঙ্গণেও দেখিতে পাওয়া যায় না! পিপাসাশূন্য জ্ঞানালোচনার এই ত পরিণাম। জাপানের জ্ঞান-তৃষ্ণা আর আমাদের যুবকগণের তৃষ্ণা, দুই তুলনা করিলে অবাক্ হইতে হয়। সম্প্রতি "সঞ্জীবনী"তে কোনও বাঙ্গালী যুবক জাপানে পদার্পণ করিয়াই যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল :—

"জাপানীদের জ্ঞানতৃষ্ণা যেরূপ, অন্য কোন জাতির সেরূপ আছে কি না সন্দেহ। কি ছোট কি বড়, কি ধনী, নির্ধন, কি বিদ্বান, কি মূর্খ, সকলেই নূতন বিষয় জানিতে এতদূর আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে যে ভাবিলে অবাক হইতে হয়। জাহাজ হইতে জাপানে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে যে আভাস পাইয়াছিলাম তাহাতেই মনে করিয়াছিলাম, এরূপ জাতির উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

চাকরাণীগুলি পর্য্যন্ত বাহিরের বিষয় সম্বন্ধে যতটা খোঁজ রাখে আমাদের দেশের অধিকাংশ ভদ্রমহিলাই তাহা জানেন না।"

বস্তুতঃ একটু তলাইয়া দেখিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায় যে এই সংগ্রাম—দুঃখ দারিদ্র্য অতিক্রম করিয়া জ্ঞানানুধাবনের প্রবৃত্তি, দুইটি মহীয়সী আসক্তি দ্বারা পরিপুষ্ট। এই দুইটি প্রবৃত্তির কোন্‌টি প্রথম এবং কোনটি দ্বিতীয় ইহা নির্দ্ধারণ করা দুরূহ। জ্ঞানস্পৃহা প্রবৃত্তিদ্বয়ের একটি, জাতীয়জীবন প্রতিষ্ঠা অপরটি। এই দুইটির সমন্বয়েতেই জাপান আজ পাশ্চাত্য সভ্যতা ও জ্ঞানের সংগ্রামে অটুট। 'আমি উপলক্ষ্যমাত্র, দেশের ও মানব সমাজের কল্যাণ আমার মুখ্য উদ্দেশ্য, স্বদেশ আমার জগতের ইতিহাসে শীর্ষস্থান অধিকার করুক, এই বাণী জাপযুবকহৃদয়ের ধমনীতে তাড়িৎপ্রবাহ সঞ্চার করিয়াছে। এই ভাব জাতীয় জীবনে ওতপ্রোতভাবে বিরাজমান। বাঙ্গালার যুবক! সমগ্র ভারতের যুবক! তোমাদের হৃদয়তন্ত্রী কি এ সঙ্গীতে বাজিয়া উঠে না? তোমাদের কি জগতের জ্ঞানকোষে অর্পণ করিবার কিছুই নাই? তোমরা কি চিরকাল পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবে?

এখন একবার ফ্রান্সের দিকে তাকাইয়া দেখা যাউক। ফরাসী বিপ্লবের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এই জ্ঞানপিপাসা কি প্রকার বলবতী হইয়াছিল, তাহা বাক্‌ল্ (Buckle) সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। যখন লাবোয়াসিয়ে, লালাণ্ড, বাঁফো প্রভৃতি মনীষিগণ প্রকৃতির নবতত্ত্ব সকল আবিষ্কার করিয়া সরল ও সরস ভাষায় জনসাধারণের নিকট প্রচার করিতে লাগিলেন, তখন ফরাসী সমাজে ধনীর রম্য হর্ম্ম্যে ও দরিদ্রের পর্ণকুটীরে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ইহার পূর্ব্বে বিজ্ঞান-সমিতিতে যে সকল বৈজ্ঞানিক বিষয় আলোচিত হইত, তাহা শুনিবার জন্য দুই চারি জন বিশেষজ্ঞমাত্র উপস্থিত হইতেন। কিন্তু এই নূতন

বার্ত্তা শুনিবার জন্য সকল শ্রেণীর লোক ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। যে সকল সম্ভ্রান্ত মহিলা ইতর লোকের সংস্পর্শে আসিলে নিজেকে অপবিত্র জ্ঞান করিতেন তাঁহারাই পদমর্য্যাদা ভুলিয়া লেকচার শুনিবার জন্য নগণ্য লোকের সহিত ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া বসিবার একটু স্থান পাইলেই চরিতার্থ হইতেন।

সম্প্রতি এক ধুয়া উঠিয়াছে যে, বহু অর্থব্যয়ে যন্ত্রাগার (Laboratory) প্রস্তুত না হইলে বিজ্ঞান শিক্ষা হয় না। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের গ্রামে ও নগরে, উদ্যানে ও বনে, জলে ও স্থলে, প্রান্তরে ও ভগ্নস্তূপে, নদী ও সরোবরে তরুকোটরে ও গিরিগহ্বরে, অনন্ত পরিবর্ত্তনশীল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অভ্যন্তরে জ্ঞান-পিপাসুর যে কত প্রকার অনুসন্ধের বিষয় ছড়ান রহিয়াছে, তাহা কে নির্ণয় করিবে? বাঙ্গালার দয়েল, বাঙ্গালার পাপিয়া, বাঙ্গালার ছাতারের জীবনের কথা কে লিখিবে? বাঙ্গালার মশা, বাঙ্গালার সাপ, বাঙ্গালার মাছ, বাংলার কুকুর, ইহাদের সম্বন্ধে কি আমাদের জানিবার কিছুই বাকী নাই? এদেশের সোঁদাল, বেল, বাবলা ও শ্যাওড়ার কাহিনী শুধু কি ইউরোপীয় লেখকদিগের কেতাব পড়িয়াই আমাদিগকে শিখিতে হইবে? এদেশের ভিন্ন ভিন্ন কৃষিপ্রণালী, প্রাচীন ভিন্ন ভিন্ন ক্রীড়াপদ্ধতি,—এ সবের ভিতরে কি আমাদের জ্ঞাতব্য কিছুই থাকিতে পারে না?

রসায়ন, পদার্থবিদ্যাদি শাস্ত্র সম্বন্ধে যাহাই হউক না কেন, প্রাণিতত্ব, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও ভূতত্ত্ববিদ্যার মৌলিক গবেষণা যে বিরাট যন্ত্রাগারের অভাবেও কতক দূর চলিতে পারে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ছুরি, কাঁচি, অণুবীক্ষণ ইত্যাদি সরঞ্জাম কিনিতে ১০০৲ টাকার অধিক মূল্য লাগে না; কিন্তু গোড়াতেই গলদ, জ্ঞানের পুণ্য পিপাসা কোথায়?

এদেশের প্রকৃতিবিদ্যার্থী যুবক দেখিয়াছেন, এখন একবার ইউরোপের প্রকৃতিবিদার্থী যুবকের কথা শুনুন। বিদ্যাবিষয়ক উপকরণ আহরণের জন্য জ্ঞানপিপাসু ইউরোপীয় যুবক আফ্রিকার নিবিড় শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে প্রাণ হাতে করিয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহের অনুসন্ধানের নিমিত্ত আহার নিদ্রা ভুলিয়া কার্য্য করিতে থাকেন, ভোগলালসা তখন তাঁহাদিগকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। জ্ঞানপিপাসা তাঁহাদের হৃদয়ের একমাত্র আসক্তি। আপনারা অনেকেই জানেন উদ্ভিদ্‌নিচয় আহরণের জন্য স্যার জোসেফ হুকার (Sir Joseph Hooker) ১৮৪৫খৃঃ অব্দে কত বিপদ আলিঙ্গন করিয়া হিমালয় পর্ব্বতের বহু উচ্চদেশ পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়াছিলেন। সে সময়ে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে হয় নাই। কাজেই তখন হিমাচলারোহণ এখনকার মত সুগম ছিল না। তুষারমণ্ডিত মেরুপ্রদেশের প্রাকৃতিক অবস্থা জানিবার জন্য কত অর্থ ব্যয়ে কতবার অভিযান প্রেরণ করা হইয়াছে; কত বৈজ্ঞানিক তাহাতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশে কি অদম্য উৎসাহ, কি অতৃপ্ত জ্ঞানপিপাসা! যখন ন্যান্‌সেন (Nansen) ফিরিয়া আসিলেন, সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকা তাঁহার ভ্রমণকাহিনী শুনিবার জন্য ব্যাকুল।*

অনুপমা।

অয়ি জন্ম-জন্মান্তের জীবন-সঙ্গিনী,
কল্যাণী মানসী মোর! দেবী মন্দাকিনী
আরাধ্য দেবতা সম যে দিন প্রথম
লভিলেন সাগরের পবিত্র সঙ্গম
বহু তপস্যার পরে, সেই দিন হতে
শত বাধা অতিক্রমি' শত লক্ষ স্রোতে
কত স্নিগ্ধ সুধা-ধারা করিয়া অর্পণ
করিলা অর্চ্চনা তার নিত্য অনুক্ষণ
অদ্যাবধি প্রেমময়ি! মোর মনে হয়,
তুমি যত পুণ্য-প্রেমে এ শূন্য হৃদয়
করিয়াছ পূর্ণ মোর জন্ম-জন্ম ধরি
অকাতর-করুণায় দিবস-শর্ব্বরী
আত্ম-হারা জ্ঞান-হারা, তা'রি সনে হায়!

---

* রাজসাহীতে সাহিত্য সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতি বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের বক্তৃতা। আগামী বারে সমাপ্য।

হয় না তুলনা কভু জাহ্নবী-ধারায়
চির-অতুলনা অয়ি!
সিন্ধু সে মহান;—
সাম্যের আদর্শপূত, জাহ্নবীর দান
করে নাই স্ফীত তারে, দেয়নি গৌরব,—
তুচ্ছ পঙ্ক আবর্জ্জনা হাস্য-মুখে সব
গ্রহণ করেছে শুধু, দেখেনি ভাবিয়া
কত প্রেম তা'রি সাথে এনেছে বহিয়া
নিঃশব্দে হিমাদ্রি-সুতা!
ক্ষুদ্র নর আমি;—
তব প্রেম অয়ি দেবি, মোরে দিন-যামি
করেছে পবিত্র ধন্য, উর্দ্ধে স্বর্গ-মুখে।
অলক্ষ্যে অজ্ঞাতে অতি প্রশান্ত কৌতুকে
নিয়ে গেছে সদা মোরে করি আকর্ষণ
কি অচিন্ত্য শুভ-ক্ষণে, ভাস্কর যেমন
শুষি' লয় বারি-কণা তীব্র রশ্মি-জালে
বিশ্ব-হিতে সারাদিন! তুমি কোনো কালে
অযোগ্য ভকতে তব পঙ্কিল সম্ভারে
করনি অর্চ্চনা প্রিয়ে, ত্রিদিব মাঝারে
অমর-বাঞ্ছিত যেই সত্য ভালবাসা
অতি শ্রেষ্ঠ নিরমল, মোর সাধ-আশা
তাই দিয়ে তুমি শুধু মিটায়েছ হায়
প্রতি পলে আশাতীত!
সর্ব্ব সুষমায়
লজ্জা দাও তুমি সখি, আপন অপার
ভুবন-মোহন রূপে, চরণে তোমার
বিশ্বের সৌন্দর্য্য কাঁদে করুণার কণা
কাতরে সকলে প্রাণে করিয়া কামনা
সৌন্দর্য্য-নিলয়া অয়ি! রবি-চন্দ্র-তারা
চেয়ে রয় তব পানে হয়ে আত্ম-হারা
নিশিদিন, শ্রীঅঙ্গের চারু গন্ধ মাখি'
মন্দমন্দ বহে বায়ু কুসুমিত শাখী
দোলায়ে আনন্দ ভরে, হাস্যবিন্দু তব
চুরি ক'রে লক্ষ কলি নিত্য অভিনব
ফুটে উঠে প্রকৃতির কুঞ্জে কুঞ্জে হায়
কি গৌরবে অতুলন! বিচিত্র ছটায়
তোমার অঞ্চল খেলে শ্যাম শস্প'পরে
বিতরি' সু-বর্ণ-রেণু, বিহঙ্গ সু-স্বরে
তব কণ্ঠ অনুসরি' ত্রিলোক মাতায়
অপূর্ব্ব বন্দনা-গানে, ঊষায় সন্ধ্যায়
নিত্য নিত্য প্রিয়তমে! মুগ্ধা শৈল-বালা
মাগি লয়, প্রতি পাদক্ষেপে লো চঞ্চলা,
তব অঙ্গে জাগি উঠে অনন্ত সুন্দর
ছন্দের তরঙ্গ যেই, বহে নিরন্তর
বিশ্ব-দ্বারে তা'রি বার্ত্তা! দীর্ঘ তপস্যায়
ক্ষণেকের তরে শুধু লভি সিদ্ধি হায়,
সুগোপন সুকোমল চিত্তের তোমার
অক্ষয় আনন্দোচ্ছ্বাস পুলকে অপার
নিয়ে আসে ঋতুরাজ ত্রিদিব-সুখের
প্রবল প্লাবন সম!
মর-জগতের
অমৃত রূপিনী অয়ি প্রেয়সী আমার!
এ বিশ্বে ভঙ্গুর সবি, স্বপ্ন-পারাবার
দিশে দিশে দিশা-হারা করিয়া সবায়
উথলিছে মুহুর্মুহুঃ, কি মহা মায়ায়
সবে যেন নিতে চায় ব্যাকুল হৃদয়ে
বাঁধি' দৃঢ় আলিঙ্গনে!
যায় অস্তালয়ে
রবি শশী, তারকার সুস্নিগ্ধ কিরণ
নিভে আসে, থেমে যায় ক্ষুদ্র সমীরণ
তাপ দগ্ধ বসুধায় করিয়া বীজন
মাতৃ-স্নেহে অকাতরে; প্রসূন শোভন
দু'দিনে বিশুষ্ক হয়ে ঝরে পড়ে ধীরে
অসহায় শিশু সম; বিবর্ণ-তিমিরে
ডুবে যায় তৃণের সে শ্যামল মাধুরী
কাল-বশে একদিন; সঙ্গীত-লহরী
থেমে যায় বিহঙ্গের; প্রমত্তা তটিনী
শান্ত হয়ে আসে, ক্রমে ক্ষীণা বিষাদিনী;—
প্রথম আবেশে যথা প্রদানি' নবোঢ়া
প্রাণেশে যৌবন-অর্ঘ্য অবসাদ ভরা

অকালে কালের চক্রে। বসন্ত ফুরায়
একটু মধুর স্মৃতি রাখিয়া ধরায়
চির-বিরহীর ক্ষণ-মিলনের মত
তৃপ্তি-হীন হর্ষ মাখা।
তুমি গো শাশ্বত
অয়ি মোর অন্তর্লক্ষ্মী, মর্ম্ম-বীণা-পাণি,
হৃদি-নন্দনের মোর প্রেমদা ইন্দ্রানি,
সুখদা বরদা অয়ি। তব শোভারাশি
চিরদিন সমভাবে রহে গো বিকাশি'
দেব-আশীর্ব্বাদ সম! ভুবন আমার
বারেক মুহূর্ত্তরে করিয়া আঁধার
তুমি ত যাও না কভু অস্তাচলে প্রিয়ে,
বিন্দু-বিশ্রামের আশে। সদা বিতরিয়ে
পুণ্য-প্রভা, ম্লান তুমি নহ কোন দিন
চির-জ্যোতির্ম্ময়ী অয়ি! তুমি মৃত্যু-হীন ;—
সুস্থির-যৌবনা তুমি। অফুরন্ত-সুখ
অফুরন্ত হর্ষ সাথে ওই কান্ত বুক
পূর্ণ করি রহিয়াছে! তব সুধা-স্বর
আমার মানস-কুঞ্জে জাগে নিরন্তর
উদ্ভ্রান্ত আকুল করি! তুমি শত রূপে
আমার 'আমিত্ব' হরি' চুপে চুপে চুপে
মঙ্গল-ইচ্ছার তব কল্প-তরু-বনে
মোরে নিয়ে যেতে চাও একান্তে গোপনে
মগ্ন হতে তব মহা তপস্যার মাঝ,
সাধক-বৎসলা অয়ি!
ভাবি আমি আজ
অনাদি অনন্ত তুমি! অগম্য মহান্
তোমার অপূর্ব্ব সত্তা! দেবতার দান
তুমি মম! বিশ্ব-জয়ী কল্পনা আমার
পারে না করিতে স্পর্শ ছায়ায় তোমার
শত চেষ্টা-সাধনায়! তুমি লোকান্তরে
আশ্বাস-প্রাসাদ কিবা আপনার করে
বিরচিয়া মোর লাগি অজ্ঞাতে সবার
রাখিয়াছ প্রাণময়ি! কেহ কভু আর
দেয় নাই মোরে হায়, এত ভালবাসা
উৎসর্গিয়া আপনায়! মোর এত আশা
করে নাই পূর্ণ কেহ!
তাই ভুলে হায়,
ভাবি কভু, তুমি বুঝি বিদগ্ধ ধরায়
সর্ব্ব তাপ-গ্লানি-হারী সুশীতল ছায়া
রমণীয়, আরাধ্যের অনাবিল মায়া
সংসার-শ্মশানে এই!
অয়ি বিশ্ব-রমা,
রূপে গুণে সত্য তুমি চির-অনুপমা !!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

ভারত-নারীর অবস্থা।

বিগত সমাজ-সংস্কার সমিতির অধিবেশন উপলক্ষে মান্দ্রাজে ভারত-নারীর উন্নতি বিষয়ে কয়েকটী প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রামনাথ আয়ার স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন :—

"গবর্ণমেন্ট, খ্রীষ্টান মিশনারীগণ এবং অন্যান্য যে সকল ব্যক্তি বা সমিতি এদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য চেষ্টা করিতেছেন, এই সমিতি তাহাদের চেষ্টার প্রশংসা করিতেছেন। সমিতি ইচ্ছা করেন, সকল ভারতবাসী স্ত্রীশিক্ষা-প্রসারকারী উপায় সমূহের সমর্থন করেন এবং আপন আপন বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন অথবা অন্য প্রকারে গৃহে তাহাদিগকে প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষা প্রদান করিবার ব্যবস্থা করেন। * * *"

এই প্রস্তাব উত্থাপন কালে আয়ার মহাশয় বলেন, বালকদিগের ন্যায় বালিকাদিগকেও যে শিক্ষা দেওয়া উচিত এদেশের পিতামাতাগণ এখনও তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা পিতামাতার অবশ্য পালনীয় গুরুতর কর্ত্তব্য।

এই প্রস্তাবের সমর্থন উপলক্ষে শ্রীমতী হাচেল বলেন যে, "আজ কাল শিক্ষার কথা অনেক শোনা যাইতেছে, কিন্তু আমি ইচ্ছা করি যে শ্রোতাগণ শিক্ষা সম্বন্ধে ম্যাথু আর্ণল্ডের সংজ্ঞা গ্রহণ করেন। ম্যাথু আর্ণল্ড বলেন, "Education was an atmosphere,

a discipline and a life" অর্থাৎ শিক্ষা এক মানসিক আবহাওয়াতে বাস, শিক্ষা—জীবন গঠন। বালিকাদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে এ কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, যে তাহারাই পরবর্ত্তী বংশের জননী হইবে। শিশুদিগের উপর মাতার প্রভাব কত তাহা আমরা সকলেই জানি। আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, যে শিশুগণ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে তাহাদের প্রথম জীবন মাতারই হস্তে থাকে। এই প্রাথমিক বৎসরগুলি চরিত্রগঠনের পক্ষে অতি মূল্যবান। এই সময়ে মস্তিষ্ক-কোটর সমূহ হইতে (brain-cells) স্নায়ুগুলি বিবিধ ধারণা গ্রহণ করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে ব্যাপৃত হয়। যাহাদের নিকট শিক্ষার দ্বার অবরুদ্ধ তাহাদের হস্তে এই মূল্যবান সময়ে শিশুর শিক্ষার ভার দিলে কি ফল উৎপন্ন হয়? শিশুগণ পরে যখন বিদ্যালয়ে যাইতে আরম্ভ করে, তখন এই শ্রেণীর জননীগণ তাহাদের সহিত পূর্ণ সহানুভূতি কি প্রকারে অনুভব করিবেন, তাহাদের সকল অবস্থা তাঁহারা কিরূপে বুঝিবেন? বালকদিগকে তাঁহারা উচ্চতম কলেজে প্রেরণ করেন, সাধ্যানুসারে সকল শিক্ষাই দিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাদিগকে হয়ত এমন বালিকার সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়, যে লেখাপড়া জানে না। এই দুইয়ের মধ্যে জ্ঞানগত কি সখ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে? ভারতবর্ষে নারীর প্রভাব কত অধিক আমরা তাহা জানি, কিন্তু হায়! কত সময় এই প্রভাব ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হয়। তাহারা শিক্ষা লাভ করিলে এরূপ হইত না। জগতের সর্ব্বত্র রাজ্যের প্রজারূপে নারীগণের দায়িত্ব-জ্ঞান জাগ্রত হইতেছে। সে দিন জাতীয় মহাসমিতিতে কথিত হইয়াছে, জাপানের নারী-সম্প্রদায়ে নব যুগের আবির্ভাব হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, পুরুষগণ অনুভব করিয়াছেন, নারীর দায়িত্ব শুধু পরিবারের প্রতিই সীমাবদ্ধ নহে, সমগ্র সমাজের প্রতিও তাঁহার দায়িত্ব রহিয়াছে এবং এই বিস্তৃততর দায়িত্বপালনের জন্য তাঁহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, মস্তিষ্ক ও হৃদয় মিলিয়া যেমন মানুষ, পুরুষ ও নারী লইয়া সেই রূপ জগৎ সংসার। এই বিস্তৃত সাম্রাজ্যের প্রথম ইংরেজ অধীশ্বরী এক জন নারী, ইহা কি একটা উপেক্ষণীয় ঘটনা মাত্র? এই সুশিক্ষিতা, মহৎচরিত্রা নারীর রাজ্যশাসন কি নারীদিগকে অজ্ঞানান্ধকারে রাখিবার প্রবল প্রতিবাদ স্বরূপ নহে?"

পণ্ডিতা অচলাম্বিকা আম্মল, রুক্মিণী আম্মল, কুমারী সুন্দরামা প্রভৃতি মহিলাগণ এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে বক্তৃতা করিলে প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়।

শ্রীমতী কাশীবাই দেবধর নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী উত্থাপন করেন :—

"বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ হয়, তদপেক্ষা অধিক বয়স পর্য্যন্ত বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুবিধা প্রদান জন্য, ক্রম-বর্দ্ধনশীল জাতীয় শারীরিক অবনতির গতি অবরুদ্ধ করিবার জন্য এবং অল্প বয়সে বিধবা হইবার সম্ভাবনা হ্রাস করিবার জন্য, ইহা অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় যে কন্যা ঋতুমতী হইবার পর বিবাহদান-প্রথা দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যেখানে লোক-মত এই পরিবর্ত্তনের অনুকূল নহে সেই সেই স্থানে এই প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার সূত্রপাত স্বরূপ কন্যার বিবাহযোগ্য বয়স অন্ততঃ ১২ এবং পুত্রের বিবাহযোগ্য বয়স অন্ততঃ ১৮ বৎসর নির্দ্ধারিত হউক।"

শ্রীমতী দেবধর বলেন যে, "যদিও অনেকেই অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে পুত্র কন্যার বিবাহ দিবার ঔচিত্য স্বীকার করেন কিন্তু কার্য্যকালে অন্তরের বিশ্বাস অনুসারে চলিতে তাঁহাদের সাহস হয় না। কন্যা ঋতুমতী হইবার পর বিবাহ দেওয়া উচিত, পুনঃপুনঃ স্বীকার করিয়াও অনেকেই অতি বাল্য বয়সেই কন্যার বিবাহ দিয়া থাকেন। কোন কোন উন্নত ও শিক্ষিত পরিবারে অধিক বয়সে বিবাহ দেওয়া হয় বটে, কিন্তু এই সকল বিবাহ জনসাধারণের নিকট দৃষ্টান্ত স্বরূপ গণ্য হয় না। কারণ এই সকল সুসংস্কৃত পরিবারের সহিত জনসাধারণের কোন সংস্রব নাই। তার পর সংস্কারের মন্দ গতির আর এক কারণ, নারীগণ শিক্ষার অভাবে সংস্কারের এই প্রয়োজনীয়তা ভালরূপে বুঝিতে পারেন না, অথচ তাঁহারাই অধিক ভুক্তভোগী।"

শ্রীমতী শ্রীরঙ্গাম্মল বি, এ, এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন। তিনি বলেন, "বালিকাদিগকে সুশিক্ষা দিবার

দুইটী পথ খোলা আছে। প্রথম, তাহাদিগকে বিবাহ না দেওয়া, অবিবাহিতভাবে সন্ন্যাসিনী বা ব্রহ্মচারিণী থাকিয়া জ্ঞানোপার্জ্জন করা এবং নারীজাতির সম্মুখে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। ইহা অতি কঠিন পথ, জনসাধারণের নিকট এই প্রণালী আদৃত হইবার সম্ভাবনা অল্প। দ্বিতীয়, বালিকাদিগকে এতদূর উচ্চ শিক্ষা দেওয়া যাহার ফল এমন স্থায়ী হয় যে, বিবাহিত জীবনেও তাহারা সেই শিক্ষা অনুসরণ করিয়া চলিতে পারে। এই কারণে বালিকাদিগের বিবাহের বয়সবৃদ্ধি করা আবশ্যক।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত রামনাথ আয়ার প্রস্তাবের সমর্থন করিলে প্রস্তাবটী সর্ব্ব সম্মতি-ক্রমে গৃহীত হয়।

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করেন :—

"এই বিষয়ে সংসৃষ্ট সকলকে এই সমিতি অনুরোধ করেন যে, হিন্দু বিধবাদিগকে প্রচলিত মস্তকমুণ্ডণ প্রভৃতি দ্বারা বিকৃতাকার করিবার প্রথা রহিত করিতে এবং শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়া এবং অধ্যাপক কার্ব্বের বিধবাশ্রমের ন্যায় আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাদের অবস্থার উন্নতি করিতে এবং তাহাদিগকে লোক-সেবার উপযুক্ত করিতে, যত্নশীল হউন এবং তাহাদের পুনর্বিবাহের পথে কোন বাধা না দেন।"

শ্রীমতী নাইডু বলেন, "এইরূপ একটী প্রস্তাব উত্থাপন করা যে আবশ্যক হইয়াছে, ইহা আমাদের জাতীয় লজ্জার কারণ। জগতে অন্যান্য জাতি যখন সভ্যতার সোপানে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে সেই সময়ে আমাদিগকে, ভারত-বর্ষে, সভ্যতার প্রাথমিক অবস্থার সামাজিক প্রশ্ন সমূহ লইয়া আন্দোলন করিতে হইতেছে। আমি আশা করি, অতি সত্বর সেই দিন আসিবে যখন আমাদিগকে আর জাতীয় লজ্জার কথা জগতের সম্মুখে ঘোষণা করিতে হইবে না। সে দিন মাত্র কংগ্রেসে আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের উপায়সমূহ আলোচিত হইয়া গিয়াছে। সমাজ-দেহের অন্তঃস্থলে এইরূপ ক্ষত পোষণ করিয়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের আশা করা কি নিতান্ত দুঃসাহসিক আস্পর্দ্ধা নহে। চিন্তাশীল লোকের নিকট ইহা যেন অবিশ্বাস্য বলিয়াই মনে হয় যে, যে দেশে মনুর ন্যায় ব্যবস্থা-প্রণেতা এবং বুদ্ধের ন্যায় মৈত্রী-প্রচারক ধর্ম্মনেতার উৎপত্তি হইয়াছে, সেই দেশের পুত্রগণ এতই অধঃপতিত হইয়াছে যে, তাহারা দুর্ব্বলা নারীর কষ্ট দেখিয়াও নারীর প্রতি পুরুষোচিত স্বাভাবিক সম্মান ও মর্য্যাদা প্রদর্শন করিতে ত্রুটী প্রদর্শন করিতেছে! ইহা যেন আরও অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয় যে, যে দেশ এমন অমরকীর্ত্তিশালিনী নারীগণের সৃষ্টি করিয়াছিল যাঁহাদের নাম জাতীয় সভ্যতার ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে আজ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র পরিচিত, সেই দেশেরই কন্যাগণ শুধু যে তাহাদের মাতৃস্নেহ ভুলিয়া যাইতে পারে তাহা নহে, কিন্তু তাহাদের ধর্ম্মের প্রথম কথা—ঈশ্বরের পিতৃত্ব, নরের ভ্রাতৃত্ব এবং নারীর ভগিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতে পারে!"

তৎপর তিনি দেশের সর্ব্বত্র বিধবাশ্রম স্থাপনের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়া বক্তব্য শেষ করিলে সমর্থনান্তে সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটী গৃহীত হয়।

এ বৎসর মান্দ্রাজে ভিক্টোরিয়া হলে ভারত-মহিলা পরিষদের অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রায় আট শত মহিলা উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভিজাগাপত্তনের মহারাণী শ্রীমতী গজপতি রাও সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তামিল, তেলেগু, মারাঠি ও ইংরাজী ভাষায় নানা প্রয়োজনীয় বিষয়ে লিখিত কয়েকটী প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। সভাগৃহটী মনোহর চাইনিজ ল্যাণ্টার্ণ, মালা ও লতা পুষ্পে অতি সুন্দর রূপে সাজান হইয়াছিল। সভানেত্রী উপস্থিত হইলে এতদুপলক্ষে সংস্কৃত ভাষায় রচিত একটী সুন্দর অভ্যর্থনা-সংগীত গীত হইয়াছিল। হিন্দু প্রথামত জলযোগের আয়োজন করা হইয়াছিল। সভাগৃহ পরিত্যাগ কালে প্রত্যেক মহিলার গায়ে গোলাপজলের প্রক্ষেপ এবং তাঁহাদিগের হস্তে পান ও ফল ফুল উপহার দেওয়া হইয়াছিল।

---

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে [illegible] সরকার দ্বারা মুদ্রিত।


নেস্‌লির মাইলো ফুড্‌
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খাদ্য
ইহা হস্ত দ্বারা স্পর্শ করা হয় না
MILO FOOD
শিশুদিগের উদরাময়ের
উপকারী ঔষধ
স্বাস্থ্যকর ও বলকারক
শিশু এবং রোগীদিগের

BHARAT-MAHILA, Registered. No. C. 367

চতুর্থ ভাগ। ফাল্গুন, ১৩১৫। ১১শ সংখ্যা।

ভারত-মহিলা

সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

শ্রীসরযূবালা দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

সূচী।

BHARAT-MAHILA OFFICE—210/6, Cornwallis Street, Calcutta.

ভারত-মহিলা কার্য্যালয়—২১০।৬ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সুরমা

সুরমা প্রেমোপহারে কোহিনূর।

মণির মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'কোহিনূর'। কেন না, কোহিনূর অতি উজ্জ্বল, দোষশূন্য, অতি মনোহর। তেমনি যত কেশ তৈল আছে—তার মধ্যে "সুরমা" যেন কোহিনূর। কেন না, সুরমা দেখিতে সুন্দর, গুণে অতুলনীয় আর চিত্ত তৃপ্তিতে অদ্বিতীয়। অনেক কেশতৈল আপনি ব্যবহার করিয়াছেন, স্বীকার করি। কিন্তু সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, একবার সুরমা ব্যবহার করিয়া দেখুন—বুঝুন—সুগন্ধ প্রকৃতই প্রাণোন্মাদিনী কিনা? রমণী কমনীয় কেশকলাপের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে, সত্যই ইহা অনুপমের কিনা? গুণের তুলনায়, সুগন্ধের তুলনায়, ইহা অতুলন না কীঃ? সত্য সত্যই, সুরমা প্রেমোপহার কহিনূর।

মূল্যাদি। বড় এক শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা। ডাকমাশুল ও প্যাকিং ।৶৹ সাত আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা। ডাকমাশুলাদি ৸৶৹ তের আনা।

সর্ব্বজন প্রশংসিত এসেন্স।



রজনী গন্ধা। রজনী-গন্ধার গন্ধটুকু নিতান্তই স্নিগ্ধ-কোমল। এই কমলতাই রজনী গন্ধার নিজস্ব।

সাবিত্রী। সাবিত্রী সাবিত্রী চরিত্রের মতই পবিত্র পদার্থ।

সোহাগ আমাদের 'সোহাগ' সোহাগের মতই চিত্তাকর্ষক।



মিলন "মিলনের" সুবাস মিলনের মতই মনোরম।

রেনুকা। আমাদের 'রেণুকা বিলাতী কাশ্মীরী বোকে অপেক্ষা উচ্চ আসন অধিকার করিয়াছে।

মতিয়া। আমাদের মতিয়ার সৌরভে বিলাতী জেসমীনের গৌরব পরাজিত হইয়াছে।

প্রত্যেক পুষ্পসার বড় এক শিশি ১৲ এক টাকা। মাঝারি ৸৹ আনা। ছোট ॥৹ আট আনা। প্রিয়জনের প্রীতি-উপহার জন্য একত্র বড় তিন শিশি ২॥৹ আড়াই টাকা। মাঝারি তিন শিশি ২৲ দুই টাকা। ছোট তিন শিশি ১।৹ পাঁচ সিকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র। আমাদের ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার এক শিশি ৸৹ বার আনা, ডাকমাশুল ।৹ পাঁচ আনা। অডিকলোন ১ শিশি ॥৹ আট আনা। মাশুলাদি ।৶৹ পাচ আনা। আমাদের অটো ডি রোজ, অটো অব্ নিরোলী, অটো অব্ মতিয়া ও অটো অব খস্খস্ অতি উপাদেয় পদার্থ। প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা, ডজন ১০৲ দশ টাকা।

মিল্ক্ অব্ রোজ।—ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায়। ব্রণ, মেচেতা, ছুলি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি ॥৹ আট আনা, মাশুলাদি ।৶৹ পাঁচ আনা।

এসেন্সের জন্য নানাপ্রকার সুন্দর শিশি ও এসেন্সের অন্যান্য সমস্ত সাজসরঞ্জাম আমরা খুচরা ও পাইকারী বিক্রয়ার্থ প্রচুর সংগ্রহ রাখিয়াছি। মূল্য বাজার দর অপেক্ষা অনেক কম। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানী,
ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিষ্টস্।
১৯।২নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

চিকিৎসা দ্বারা পরীক্ষিত আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ।

মহামেদরসায়ন

"মহামেদ-রসায়ন" সেবন করিয়া অল্প মেধা ও বিলুপ্ত বা নষ্ট-স্মৃতিসম্পন্ন বিদ্যালয়ের বালক-বালিকাগণ অচিরে মেধাবী হয় পাঁচ ঘণ্টার পাঠ এক ঘণ্টায় কণ্ঠস্থ হয়, এবং পুনরায় ভুলিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে না।

"মহামেদ-রসায়ন" জগতে অদ্বিতীয়,

ইহার ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন ঔষধ ইতিপূর্ব্বে কাহারও দ্বারা আবিষ্কৃত হয় নাই।

'মহামেদ-রসায়ন' স্নায়বিক দুর্ব্বলতার আশ্চর্য্য ঔষধ

অর্থাৎ অতিরিক্ত অধ্যয়ন, অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম, অতিরিক্ত চিন্তা, অতিরিক্ত মস্তিষ্কপরিচালন প্রভৃতি জনিত স্নায়বিক দুর্ব্বলতা (Nervous Debility), স্মরণশক্তির হ্রাস, মস্তকঘূর্ণন, মস্তক গরম প্রভৃতি, এবং তজ্জনিত উপসর্গগুলির একমাত্র আরোগ্যকর ঔষধ "মহামেদ রসায়ন"।

"মহামেদ-রসায়ন" মস্তিষ্কপরিচালনশক্তিবর্দ্ধক,—

অর্থাৎ,—অধিক পরিমাণে মস্তিষ্ক আলোড়ন করার জন্য যাঁহাদিগকে মস্তকের ব্যায়ামে কষ্ট পাইতে হয়, এবং যাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই অতিরিক্ত পরিমাণে মস্তিষ্কের চালনা করিতে হয়, (বিচারক, ব্যারিষ্টার, উকিল, মোক্তার, কবি, সম্পাদক, ছাত্র প্রভৃতি মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ ও কার্য্যক্ষম রাখিতে হইলে "মহামেদ-রসায়ন" ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

"মহামেদ-রসায়ন" মূর্চ্ছা ও উন্মাদের অব্যর্থ ঔষধ,

"মহামেদ-রসায়নের" মূল্যাদির কথা,

১ এক শিশি ১৲ এক টাকা, মাশুল ।৵০ ছয় আনা; দুই শিশি ২৲ দুই টাকা, মাশুল ॥০ আট আনা; ৩ শিশি ২॥০ আড়াই টাকা, মাশুল ॥৵০ দশ আনা; এবং একত্রে ৬ ছয় শিশি ৫৲ পাঁচ টাকা, মাশুল ৸৵০ চৌদ্দ আনা ইত্যাদি।

হরলাল গুপ্ত কবিরাজ।

১ নং বাবুরাম ঘোষের লেন, আহিরীটোলা, কলিকাতা



মাদ্রাজী মহিলা।

ভারত-মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে
রমন্তে তত্র দেবতা।

The woman's cause is man's ; they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free ;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow ?

Tennyson.

৪র্থ ভাগ। ফাল্গুন, ১৩১৫। ১১শ সংখ্যা।

ভগ্নিগণের প্রতি নিবেদন *

প্রিয় ভগিনীগণ, আপনারা আমাকে ভারত-মহিলা পরিষদের বর্ত্তমান অধিবেশনের সভানেত্রী মনোনীত করিয়া অত্যন্ত সম্মানিত করিয়াছেন। আমি এই সম্মানের জন্য আপনাদের নিকট গভীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। যখন মাননীয় বিচারপতি শঙ্কর নায়র মহাশয় আমাকে এই পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন তখন প্রথমতঃ ইহা গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিতেই আমার ইচ্ছা হইয়াছিল। কারণ আমি এই সম্মানের উপযুক্ত নহি। আমি জানি, নিশ্চয়ই আমা অপেক্ষা এ কার্য্যের জন্য উপযুক্ততর লোক রহিয়াছেন। তা' ছাড়া, জীবনের সেই মহা শোকের পর † আমি কোন প্রকাশ্য কার্য্যে আর যোগ দেই নাই। নিমন্ত্রণ পাইবার পর এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত আমি তাঁহার পত্রের কোন উত্তর দেই নাই। অনেক চিন্তার পর দুইটী কারণে আমি এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছি। প্রথমতঃ, ভারতীয় নারীজাতির দুর্গতি মোচনের জন্য, তাহাদের অভাব ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার আলোচনার জন্য যে আন্দোলনের উৎপত্তি, আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করিলে তৎপ্রতি আমার সহানুভূতির অভাব প্রকাশ পাইত। দ্বিতীয়তঃ, আমি এই নিমন্ত্রণকে আদেশ—কর্ত্তব্যের আহ্বান বলিয়া অনুভব করিলাম। এই ভাব প্রাণে লইয়া আমি আজ আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত।

ভারত-নারীর অবস্থার আলোচনা, পরস্পরের সহিত প্রীতি স্থাপন এবং আমাদের উন্নতির উপায় নির্দ্ধারণ, এই সকলের জন্য আমরা অদ্য এখানে সম্মিলিত হইয়াছি। ইহা অপেক্ষা উন্নততর, পবিত্রতর কাজ আর নাই। স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার

---

* মান্দ্রাজের ভারত মহিলা পরিষদের অধিবেশনে সভানেত্রী মহারাণী শ্রীমতী [illegible] রাও কর্ত্তৃক বিবৃত।

† বৈধব্য।

আবশ্যক নাই, কারণ নারী-ভাগ্যের উন্নতি সাধনে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এখন সকলেই স্বীকার করেন। হিন্দুনারীর শিক্ষার কঠোর বিরুদ্ধাচরণ সৌভাগ্যবশতঃ এখন লোপ পাইয়াছে এবং স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি বিষয়ে আশাপ্রদ চেষ্টা দেখা যাইতেছে। সকলেই বুঝিতেছেন, স্ত্রীশিক্ষা সমাজ, নীতি ও ধর্ম্ম সকল প্রকার উন্নতিরই পরম সহায়। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে,— মহিলারা নিজেরাও তাঁহাদের উন্নতির প্রতি গভীর মনোযোগ প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমাদের ভগিনীগণের মধ্যে শিক্ষার যাহাতে বিস্তার হয় সে বিষয়ে আমাদের সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। সৎ ও অসৎ, পাপ ও পুণ্য এই দুইয়ের পার্থক্য যাহাতে বোধগম্য হয় তাহাই শিক্ষা। জ্ঞান অজ্ঞানতা-অন্ধকার দূর করিবার আলোকস্বরূপ। সুতরাং স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে উভয় জাতির পক্ষেই জ্ঞানার্জ্জন অবশ্যপাল্য কর্ত্তব্য এই জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে হইলে শিক্ষার সাহায্য অপরিহার্য্য। সমৃদ্ধিশালী রাজা স্বদেশেই পূজা ও সম্মান লাভ করিয়া থাকেন, কিন্তু জ্ঞানবান লোক সর্ব্বত্র সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করেন। অতএব আপনারা সকলে জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি সাধনে তৎপর হউন।

শিক্ষার উপকারিতা।—আমি শিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব। শিক্ষা হইতে জ্ঞানলাভ হয়, জ্ঞানের সাহায্যে সময়ের অপব্যয় না করিয়া ও স্বামীদিগকে ক্লেশ না দিয়া আমরা গৃহকার্য্য উৎকৃষ্টরূপে সম্পন্ন করিতে পারি। তা ছাড়া শিক্ষিতা নারীগণ পরস্পরের সহিত প্রীতি স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইয়া থাকেন, সুতরাং সমাজ হইতে কলহ কোন্দল দূরে পলায়ন করে। ইহা শিক্ষার উপকারিতার এক দিক মাত্র। জানকী. দ্রৌপদী, সাবিত্রী প্রভৃতির কাহিনী পাঠ করিয়া তাঁহাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করিতে আমাদের আকাঙ্ক্ষা জন্মে। দুর্ভাগ্য যখন পরিবারে আপতিত হইয়া আমাদিগকে শোকে অধীর করে, তখন উত্তর গীতা, ভগবদ্গীতা এবং এই শ্রেণীর অন্যান্য পৌরাণিক গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা শোকদগ্ধ প্রাণে শান্তি লাভ করি। শিক্ষা লাভ করিলে অবসর কালে বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা আত্মাকে উন্নত করিতে পারি। শিক্ষিতা নারীর পক্ষে অর্থ, দয়া, প্রেম ও মোক্ষ সহজলভ্য। সীতা, অনুসূয়া চন্দ্রমতী, দময়ন্তী এই সকল নারীকুলমণি তাঁহাদের শিক্ষা ও পতিভক্তিগুণেই জগতে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন! শিক্ষা আমাদিগের ঈশ্বর-জ্ঞান লাভের পরম সহায়। শিক্ষা দ্বারা পতিপ্রেম, পিতৃমাতৃভক্তি, ভ্রাতা ভগিনীর প্রতি ভালবাসা, অন্যের উপকার-কামনা, জীব জন্তুর প্রতি দয়া, এবং অন্যান্য সৎবৃত্তির বিকাশ হয়। প্রাচীন গ্রন্থ পাঠে আমরা অবগত হই. পুরাকালে কোন কোন নারী সৎগ্রন্থ প্রণয়ন ও আত্মত্যাগ দ্বারা লোকের উপকার সাধন করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। আমি সংক্ষেপে পুরাকালের শিক্ষিতা নারীগণের বিষয় কিছু আলোচনা করিব।

কুমারী গার্গী সুশিক্ষিতা নারী ছিলেন, তিনি একখানা উপনিষদ রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত আছে, কপিল তাঁহার মাতা দেবহুতিকে সাংখ্য দর্শন শিক্ষা দিয়াছিলেন। ধর্ম্মশীলা সাধ্বী সীতাদেবী বেদান্ত শাস্ত্রে পারদর্শিনী ছিলেন। স্বামীর অভিপ্রায়ানুসারে অঞ্জনা-নন্দনকে তিনি বেদান্ত শিক্ষা দিয়াছিলেন। "সীতারামাঞ্জনেয়" সংবাদে এইরূপ বর্ণিত আছে।

অক্ষক্রীড়া কালে দ্রৌপদী সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া ভীষ্ম ও অপরাপর কুরুবৃদ্ধদিগকে আইন বিষয়ে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন;—'ধর্ম্মরাজ পূর্ব্বে আপনাকে পণ স্বীকার করিয়া হারিয়াছিলেন, না দ্রৌপদীকে হারিয়া পরে আপনাকে হারিয়াছিলেন।'

মহাভারতে দৃষ্ট হয়. বিরাট রাজা স্বীয় কন্যা উত্তরাকে নৃত্যকলা শিক্ষার জন্য বৃহন্নলার শিক্ষাধীন রাখিয়াছিলেন।

প্রাচীন গ্রন্থে ইহাও পাঠ করা যায় যে, কুমারী রত্নাবলী স্বীয় স্মৃতি হইতে প্রেমাস্পদের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া বিরহ-ব্যথা শান্ত করিয়াছিলেন।

অতি প্রাচীন কাল হইতে এ দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত ছিল। মুসলমান বিজয়ের পর হইতে এ দেশে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা উভয়ই সঙ্কুচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

যদিও স্ত্রীশিক্ষার যথেষ্ট অবনতি হইয়াছিল, কিন্তু

আমাদের স্বর্গীয়া সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে স্ত্রীশিক্ষার পুনরুন্নতি আরম্ভ হইয়াছে। এখন প্রতি সহরে ও অনেক বড় বড় গ্রামে বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখন বালকদিগের শিক্ষা বিষয়ে আমরা যেমন ব্যস্ত, আমাদের কন্যাগণের শিক্ষা বিষয়েও আমাদিগকে তেমনই ব্যাকুল হইতে হইবে। ঈশ্বরের অস্তিত্বে জ্ঞানমূলক নিঃসন্দিগ্ধ বিশ্বাস, ধর্ম্মের মুখ্য প্রয়োজনীতার অনুভব এবং নীতি ও ধর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা মোক্ষ লাভের ভিত্তি আবিষ্কার করিতে পারিলেই শিক্ষার সর্ব্বোত্তম সার্থকতা হয়। শুধু পূজায় ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন না তাঁহার বিধান যাহারা লঙ্ঘন করে পূজা পাইলেও তিনি তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন না। তাঁহার বিধি বুঝিবার জন্য, তাহা পালন করিবার জন্য জ্ঞানের আবশ্যক, জ্ঞানের জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা।

তার পর শিশুদিগকে গঠন করিয়া তোলা নারীজাতির এক মহৎ কর্ত্তব্য। মাতৃজাতি শিক্ষিতা না হইলে এই কর্ত্তব্য কিছুতেই সুসম্পন্ন করিতে পারেন না। মাতার নিকটেই প্রাথমিক শিক্ষা পাওয়া শিশুর পক্ষে স্বাভাবিক। মাতা শিক্ষিতা না হইলে তিনি সন্তানকে কিরূপে উপযুক্ত শিক্ষা দিবেন? সুতরাং নিজের জন্য না হইলে শুধু সন্তানের জন্যই আমাদিগের শিক্ষালাভ আবশ্যক, আমরা মাতৃজাতি। পুরুষজাতি ও নারীজাতি উভয়কেই প্রস্তুত করিবার ভার আমাদের হস্তে। আমাদের প্রকৃত সন্তানবাৎসল্য তবে বৃথা আদরে পর্য্যবসিত না হইয়া এই ভাবেই প্রকাশিত হউক। বাল্যকাল হইতেই তাহাদিগকে পিতামাতার প্রতি বাধ্যতা, রাজার প্রতি রাজভক্তি এবং ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি কর্ত্তব্য আপনারা শিক্ষা দিন্। জননীগণ তাহাদিগকে সত্যবাদিতা, ধৈর্য্য, প্রীতি, বাধ্যতা এবং ভগবানের সৃষ্ট জীবজন্তুর প্রতি দয়া শিক্ষা দিতে শৈথিল্য করিবেন না। ছোট ছোট শিশুদিগকে এই ভাবে গঠিত করিতে হইলে ছোট ছোট শিশুচিত্তরঞ্জক কবিতা, ঘুম পাড়ানিয়া গান প্রভৃতিতে মাতৃগণের অধিকার থাকা আবশ্যক; এবং এই উপায়ে যে শিক্ষা প্রদত্ত হয় শিশুগণের জীবনে তাহা ফলপ্রসূ হইতেছে কি না তদ্বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। শিশুদিগকে প্রহার করিয়া শাস্তি যত কম দেওয়া যায় ততই ভাল। তাহাদিগকে বাধ্যতা শিক্ষা দিতে আমরা যত্নবতী হইব এবং ভালবাসিয়া তাহাদিগকে ভাল করিতে চেষ্টা করিব। আমরা অবশ্যই তাহাদের নিকট হইতে সদ্ব্যবহার আদায় করিব, কিন্তু তাহা কঠোর শাস্তি দিয়া নহে; ২।১ দিন খেলার সময় তাহাদিগকে খেলিতে না দিয়া, তাহাদের প্রিয় মিষ্টান্ন হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া এবং তাহাদিগকে বুঝিতে দিয়া যে তাহাদের অশিষ্ট ব্যবহারের জন্য তাহারা প্রাপ্য অধিকারে বঞ্চিত হইল। এই সকল সহজ উপায়ে এবং প্রত্যেকটী শিশুর চরিত্রের বিশেষত্ব বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া শিশুগণকে শৈশব হইতেই বাধ্যতা, শৃঙ্খলা প্রভৃতি উত্তমরূপে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

স্বাস্থ্য।—কিন্তু শুধু শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হইলেই হইবে না, স্বাস্থ্যের প্রতিও মনোযোগী হইতে হইবে। স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রাথমিক নিয়মগুলি জানা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকিলে মাতা ও সন্তান উভয়েরই উপকার হয়। মানুষের কর্ত্তব্য ধর্ম্মানুষ্ঠান, শরীর এই ধর্ম্মানুষ্ঠানের সাধন বা উপায়। শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্। স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সকল বিদ্যালয়েই অধীত হওয়া আবশ্যক, কিন্তু বালিকাবিদ্যালয়ে ইহা শিক্ষা দিবার বিশেষ বন্দোবস্ত থাকা আবশ্যক। কারণ ভবিষ্যতে এই বালিকাই তাহার গৃহ, স্বামী, সন্তান এবং অপরাপর পরিজনের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রধান ভাবে দায়ী হইবে। তাহার পক্ষে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের মূল সূত্রে অনভিজ্ঞতা বহুলোকের সর্ব্বনাশের কারণ হইতে পারে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ত্তৃক ব্যবস্থিত আচারনিয়মাদি স্বাস্থ্যতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই মনে হয়। এখন তাহার অপব্যবহার হইতেছে সত্য, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে প্রণীত হইয়াছিল, সেই উদ্দেশ্য বুঝিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক সেগুলি পালন করিলে স্বাস্থ্যের উপকারই হয়। যে সকল প্রবীণা মহিলা ঐ সকল আচার পালন করেন আমি তাঁহাদিগের নিন্দা করি না, কিন্তু স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে সকলেই সম্যক অভিজ্ঞতালাভ করুন, এই নিবেদন। কারণ স্বাস্থ্যসুখ সকল সুখের শ্রেষ্ঠ। বাল্যকাল হইতে

স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন করিলে বার্দ্ধক্যেও রোগ সহজে আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিবে না।

মনুষ্য-জীবন রক্ষার পক্ষে বিশুদ্ধ বায়ু, বিশুদ্ধ জল ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য এই তিনটী প্রধান অবলম্বন। তন্মধ্যে বিশুদ্ধ বায়ু সর্ব্ব প্রধান। যদি গৃহ মলিন ও আবর্জ্জনা পূর্ণ হয় তবে বাড়ীর বায়ু দূষিত হয় এবং জল ও খাদ্যে অপবিত্র বায়ুর সংস্পর্শ ঘটিয়া খাদ্য দ্রব্যকে অস্বাস্থ্যকর করিয়া তুলে। সুতরাং প্রত্যেক অপবিত্র পদার্থ অবিলম্বে বাড়ী হইতে দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে। বায়ু, জল ও খাদ্য ব্যতীত সুনিদ্রা, পরিষ্কৃত বস্ত্র প্রভৃতিও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বিশেষ আবশ্যক। ব্যায়ামও স্বাস্থ্যের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়। বালিকাদিগের এই সকল বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকা নিতান্তই আবশ্যক। সুতরাং বালিকাবিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান শিক্ষার সুবন্দোবস্ত থাকা নিতান্তই কর্ত্তব্য।

মিতব্যয়িতা।—মিতব্যয়িতা নারীগণের আর একটি প্রধান শিক্ষার বিষয়। যে গৃহে মিতব্যয়িতা নাই সে গৃহে সুখ থাকিতে পারে না। আয়ব্যয়ের সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে শিক্ষা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। গৃহকর্ত্রী গৃহের কোন কর্ম্মই ছোট মনে করিবেন না। ভৃত্যদিগের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে এবং তাহারা তাহাদের কার্য্য উৎকৃষ্টরূপে সম্পাদন করিতেছে কি না দেখিতে হইবে।

শিশু-পালন।—নারীর পক্ষে সন্তান লাভের ন্যায় সৌভাগ্য আর নাই। কিন্তু পূর্ণরূপে মাতৃত্বের সুখ উপভোগ করিতে হইলে আমাদের অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞতালাভ আবশ্যক। এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই চারিটি কথা বলিব।

জননী শিশুপালনে সর্ব্বদা যত্নশীলা হইয়া দেখিবেন, শিশু কি খায়, কি পান করে এবং কি খেলা খেলে? সকল মাতারই ইচ্ছা সন্তান দীর্ঘজীবী হয়, কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ উপায় কয়জনে অবলম্বন করেন? শিক্ষার অভাব বশতঃ জননীগণ যথেচ্ছ ভাবে সন্তান পালন করেন; মনে করেন, আমি যাহা করিতেছি তাই ভাল। ইহাতে অনেক শিশুই ভগ্নস্বাস্থ্য হয় এবং অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। বাল্যকাল হইতে শিশুদিগকে স্বাস্থ্যবিধি-সম্মত প্রণালী মতে পালন করিলে পরিণত বয়সেও সেই অভ্যাস তাহাদের পরম উপকার করে এবং তাহারা দীর্ঘজীবন লাভ করে।

শিশুর খাদ্যাদি সম্বন্ধে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে। বিশুদ্ধ বায়ু শিশুর পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়। এ বিষয়ে শিশুগণকে ছোট চারা গাছের ন্যায় বিবেচনা করিতে হইবে। আমরা যত যত্নই করি না কেন, ভাল হাওয়া না পাইলে চারা গাছ কিছুতেই বাঁচে না। বিশুদ্ধ বায়ু না পাইলে শিশুরও তাই হয়। শিশুর জন্মের দিন হইতেই প্রতিদিন স্নান করান উচিত। প্রতিদিন প্রাতঃকালে ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করাইলে শিশুর বিশেষ উপকার হয়। প্রতিদিন খোলা বাতাসে শিশুকে বায়ু সেবন করাইলে তাহার ফুস্ ফুস্ সবল হয়।

শিশুগণকে আঁটাসাটা পোষাক পরান উচিত নহে, তাহাদের পোষাক শক্ত হওয়াও উচিত নহে। গরম ও লোকসমাগমপূর্ণ গৃহে তাহাদিগকে লইয়া যাওয়া উচিত নহে।

দয়া।—জাতি ধর্ম্মের বিচার না করিয়া, প্রকৃত অভাবগ্রস্ত পাত্রকে দান করাই প্রকৃত দান। অপাত্রে দান করিলে দানে কুফলই উৎপন্ন হয়। দানের উপযুক্ত অনুষ্ঠান এদেশে অসংখ্য রহিয়াছে। পাপানুষ্ঠান করিয়া দানকে পাপের প্রতীকারের উপায় মনে করা উচিত নহে। ধর্ম্ম ধর্ম্মেরই জন্য অনুষ্ঠান করিতে হয়। আমাদের প্রচলিত ধারণা এই যে, প্রধানতঃ দেবদ্বিজেই দান করিতে হয়, কিন্তু ইহা ভ্রমাত্মক ধারণা। প্রায় প্রতি বৎসরই আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই আছে। আমাদের সদাশয় গবর্ণমেণ্ট অনেক জীবন রক্ষা করিতেছেন, কিন্তু আরও অর্থের প্রয়োজন। দুর্ভিক্ষমোচন কার্য্যে, হাঁসপাতালে এবং বিধবাশ্রম সংস্থাপনে অর্থদান বিশেষ প্রশংসার্হ।

সমাজ-সংস্কার।—একথা কেহই অস্বীকার করিবেন না, যে অনেক বিষয়ে আমাদের সামাজিক জীবনের উন্নতি আবশ্যক। আমাদের সমাজকে সংস্কৃত করিবার জন্য আমরা কিরূপ চেষ্টা করি তাহার উপর আমাদের

দেশের উন্নতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। নারীগণের অবস্থা এই সমাজ-সংস্কারের কেন্দ্রস্থল।

(১) (মান্দ্রাজ প্রদেশে) বিবাহ পাঁচ দিবস ব্যাপী সুদীর্ঘ অনুষ্ঠান। ইহা এক ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। বিবাহের ব্যয় সংকোচ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা আবশ্যক। আজ কাল এই বিবাহব্যয় অনেক পরিবারের বিনাশের কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছে। ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে (মান্দ্রাজে) এক দিনেই বিবাহ সম্পন্ন হইবার রীতি আছে, কিন্তু ইহাদেরও অনেকে অবস্থার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া ব্রাহ্মণদিগের অনুকরণে বিবাহকে সুদীর্ঘ পাঁচদিন ব্যাপী ব্যাপার করিয়া তুলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কোন ধর্ম্মমন্দিরে সম্পন্ন করিলে ব্রাহ্মণগণের বিবাহও একদিনেই সম্পন্ন হইবার নিয়ম আছে। সৌভাগ্য বশতঃ এই নিয়মটী ক্রমে ক্রমে অধিক প্রচলিত হইতেছে, কিন্তু এখনও সুপ্রচলিত হয় নাই। এক দিনেই হউক আর পাঁচদিনেই হউক, বিবাহব্যয় যাহাতে হ্রাস করা হয় এ বিষয়ে আমি সমবেত সকল ভগিনীরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

(২) আমাদের বিবাহের আর একটী লজ্জাকর উল্লেখযোগ্য বিষয় পণদান ও পণগ্রহণ। এই ব্যবসাটীর অর্থ কি? বরপণ ও কন্যাপণ কি পুত্রকন্যা ক্রয় বিক্রয় নহে? ইহা কি এক প্রকার দাসত্বপ্রথা নহে? এই "কন্যাশুল্ক" ও "বরশুল্ক" শাস্ত্র-বিরুদ্ধ এবং প্রত্যেক বিবেচক লোকের দ্বারা নিন্দিত। দুঃখের বিষয়, ক্রমে ইহা সমাজে স্থায়ী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার মূলোৎপাটন করা আপনাদেরই হাতে। বাল্যবিবাহ এবং বালবিধবার সংখ্যাবৃদ্ধি অনেক পরিমাণে এই কুপ্রথার উপর নির্ভর করিতেছে। ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যগণের কন্যাগণকেও ১১।১২ বৎসর পর্য্যন্ত অবিবাহিত রাখা কঠিন নহে। আপনারা মনোযোগিনী হইলে এই সংস্কার সাধন কিছুই কঠিন নহে।

দুঃখের বিষয়, যে সকল জাতির মধ্যে কন্যা ঋতুমতী হইলে বিবাহ দেওয়া রীতিবিরুদ্ধ নহে, তাহারাও ধীরে ধীরে অন্ধভাবে ব্রাহ্মণদিগের অনুকরণ আরম্ভ করিয়াছে। ইহাতে হতভাগিনী বালবিধবাগণের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। এক সময়ে নিষ্ঠুর সতীদাহ প্রথা এদেশে প্রচলিত ছিল। এই কুপ্রথা নারীজাতির মহা অনিষ্ট করিয়াছে। সুবিখ্যাত সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় এই কুপ্রথা দমন করিতে অগ্রসর হইয়া সহৃদয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে আইন করাইয়া কৃতকার্য্যতা লাভ করেন। আমাদের সংস্কারকগণ যদি বিশেষ চেষ্টা না করেন তবে ১১।১২ বৎসরের অল্পবয়স্কা কন্যাগণের বিবাহরূপ শোচনীয় কুপ্রথা দূর হইবে না। বোধ হয় এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের নিকট আইন-প্রণয়নের জন্য উপস্থিত হওয়া অসঙ্গত হইবে না। জাতিচ্যুতির ভয়ে ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যগণ অধিক বয়সে কন্যার বিবাহ দিতে ভয় পান এবং তাঁহাদের মধ্যে এই সংস্কার প্রচলিত হইতে এখনও বিলম্ব হইবার সম্ভব। কিন্তু সময় আসিয়াছে। সমাজনেতাগণের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া এই সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। সাহস করিয়া অগ্রসর না হইলে কোন বিষয়ে সফলকাম হওয়া যায় না।

বিধবাগণের অবস্থার উন্নতির জন্য নানা প্রকার গার্হস্থ্য শিল্পের প্রচলন আবশ্যক হইয়াছে। সেলাই-কাজ, জরীর কাজ ইত্যাদি উপায়ে অনেকের জীবিকার উপায় হইতে পারে। বালিকাবিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী, ধাত্রী ও রোগের শুশ্রূষাকারিণীর কাজ শিক্ষা করিয়া অনেকে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারেন। এ সকল বিষয়ে সুশিক্ষা লাভ করিলেই কর্ম্ম জুটিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। এই উপায়ে তাঁহারা সমাজের পরম হিত সাধন করিতে পারিবেন।

আমি আশা করি, আপনারা সকলে উল্লিখিত সংস্কার-কার্য্যগুলি হৃদয়ের সহিত সমর্থন করিবেন। ভারতীয় গৃহ পরিবার পবিত্রতার জন্য বিখ্যাত। আমি অনুনয় সহকারে নিবেদন করি, আপনারা এই পবিত্রতা সংরক্ষণে ও তাহার উন্নতি সাধনে যত্নবতী হউন। সকল অশ্লীল সাহিত্য, অশ্লীল সংগীত আমাদিগের কাছে যেন ঘেঁষিতে না পারে! সকল প্রকার পাপ সংসর্গ হইতে, পাপ প্রভাব হইতে আমাদিগের বালকবালিকাগণকে মুক্ত রাখিতে হইবে। মহাভারতে সফলতা লাভের দুইটী উপায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—আত্মপ্রভাব ও দেব-

প্রসাদ। ভগবান্ ত আমাদের কল্যাণ ও উন্নতি সর্ব্বদাই চাহেন।

সত্যপরায়ণতা।—সকল বিষয়ে সত্যপরায়ণতা মানব-জীবনের সুখের নিদান। জীবনের সকল কষ্ট ও সংগ্রামের মধ্যে সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিলেই ইহলোকে প্রকৃত বিমল সুখ ও পরলোকে আনন্দ লাভ করা যায়। এই সত্যপরায়ণতা দ্বারাই মহারাজা হরিশ্চন্দ্র তৎকালীন রাজাদিগের মধ্যে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন এবং এখনও জগতের স্মৃতিতে অমর হইয়া রহিয়াছেন। মহারাজ চক্রবর্ত্তী বলি বামনমূর্ত্তিকে ভূমি দান করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। এই দান হইতে বিরত হইতে শুক্রাচার্য্য তাঁহাকে অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু বলি এই বলিয়া শুক্রের অনুরোধ পালনে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, একবার তাঁহার মুখ হইতে যে দানসংকল্প বহির্গত হইয়াছে তিনি কিছুতেই তাঁহার প্রত্যাহার করিতে পারিবেন না,—ফল যাহাই হউক। আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থে আমরা এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত পাঠ করিয়াছি। যখন সামান্য একটী সত্যের অপলাপে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর এবং সন্তানের প্রতি পিতামাতার বিশ্বাসের হ্রাস হয় তখন অপরের উপর ইহার কি ফলাফল হয় তাহা আলোচনা করা বাহুল্য। যাহা প্রত্যক্ষ দেখা যায় বা শোনা যায় তাহা বলা কঠিন কার্য্য নহে। সত্য বলিতে হইলে কোন পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু মিথ্যা বলিতে হইলেই গল্প প্রস্তুত করিতে হয় এবং ধরা পড়িবার ভয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়। ভয়বশতঃ কোন অন্যায় কাজ করিলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা ঈশ্বর বা মানবের নিকট না বলা যায় ততক্ষণ বিবেকের দংশনে অস্থির হইতে হয়। সত্যপরায়ণ ব্যক্তির পাপে মগ্ন হইবার আশঙ্কা অল্প।

এই বিশাল ভারতখণ্ডে এখন অনেক ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মই অধিকাংশ লোকের ধর্ম্ম। আমাদের ধর্ম্মজ্ঞান বৃদ্ধির জন্য আমরা সর্ব্বদা চেষ্টা করিব; শুধু পর্ব্ব বা অনুষ্ঠানাদিতেই যে পূজার্চ্চনা করিব, তাহা নহে। নিত্য পূজা ব্যতীত প্রতি সপ্তাহে এক দিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে মহিলাগণ সম্মিলিত হইয়া রামায়ণ ও নারীর পক্ষে পঞ্চম বেদ স্বরূপ মহাভারত পাঠ করিবেন।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, যে নারীগণের উন্নতির জন্য নানা স্থানে মহিলা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। আশা করি এ সকলের সংখ্যা ক্রমে আরো বর্দ্ধিত হইবে।

বালিকাবিদ্যালয়গুলিতেও ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ ও ইতিহাস হইতে ধর্ম্মশীলা স্ত্রীদিগের গুণাবলী ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা বালিকাদিগকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। এই উপায়ে তাহারা তাহাদের কর্ত্তব্য শিক্ষা করিতে পারিবে। আসুন আমরা সকলে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে এ বিষয়ে যত্নবতী হই।

প্রিয় ভগিনীগণ, আপনারা যে কষ্ট করিয়া এখানে আসিয়াছেন এবং ধৈর্য্যের সহিত অতি সদয়ভাবে আমার বক্তব্য শ্রবণ করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ করি।

বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

আমাদের পরবর্ত্তী আলোচ্য বিষয়,—বাঙ্গালা বৈজ্ঞানিক সাহিত্য,—ইহার বর্ত্তমান অবস্থা ও ইহার ভাবী উন্নতিবিধানের উপায়নির্দ্দেশ। তিনটি দেশের সাহিত্যের ইতিহাস এ বিষয়ে আমাদিগের সহায়তা করিবে। কারণ, ইতিহাসে সদৃশ ঘটনাই ঘটিয়া থাকে। যাহা জর্ম্মাণীতে সম্ভবপর হইয়াছিল, যাহা রুশিয়া দেশে সম্ভবপর হইয়াছিল, যাহা জাপানেও সম্প্রতি সম্ভবপর হইয়াছে, তাহা বাঙ্গালা দেশেও সম্ভবপর হইবে। এই তিন দেশই অল্প সময়ের মধ্যে বৈজ্ঞানিক জগতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে জর্ম্মন সাহিত্যের কি দুর্গতি ছিল! সত্য বটে, মার্টিন লুথার মাতৃভাষায় বাইবেল অনুবাদ করিয়া জনসাধারণের মধ্যে ইহার আদর ও চর্চ্চা বাড়াইয়াছিলেন, কিন্তু বিদ্যালয়ে লাটীন ও গ্রীকই অধীত হইত, এবং রাজসভায় ফরাসী ভাষা চলিত ছিল। এমন কি, ফ্রেডারিক দি গ্রেট মাতৃভাষা ব্যবহার করিতে লজ্জা বোধ করিতেন। তিনি ফরাসী ভাষায়

কবিতা রচনা করিয়া বলটেয়ারের সমক্ষে আবৃত্তি করিতেন, এবং তাঁহার নিকট একটু বাহবা পাইলে নিজেকে ধন্য মনে করিতেন।

কিন্তু ফ্রেডারিকের মৃত্যুর কয়েক বৎসরের মধ্যেই শিলার, গেটে, ক্যাণ্ট, হিগেল প্রভৃতি এক দিকে, আবার উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে লিবিগ, হোলার প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ অপর দিকে, জর্ম্মণ ভাষাকে মহা-শক্তিশালিনী করিয়া তুলিলেন। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে রুশিয়ার যে কি দুরবস্থা ছিল, তাহা এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, মহামতি বাকল্ ক্রিমিয়া যুদ্ধের সময় এই দেশকে সুসভ্য আখ্যা দিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই অনার্য্য জাতির ভাষা আজ আদর্শস্থানীয়। যে ভাষা রুশভল্লুকের উপযুক্ত বলিয়া উপহসিত হইত, টলষ্টয়ের ন্যায় ঔপন্যাসিক সে ভাষাকে বিবিধ আভরণে সাজাইয়া জগতের সম্মুখে সমুপস্থিত করিয়াছেন। সেই ভাষাতেই বিখ্যাত রুশ রসায়নশাস্ত্রবিৎ মেণ্ডেলিফ্ স্বীয় বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান সমুদয় লিপিবদ্ধ করিয়া ইউরোপীয় অপরাপর পণ্ডিতদিগকে রুশ ভাষা শিক্ষা করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। এই ত মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধিশালিনী করিবার প্রকৃষ্ট উপায়।

অধিক কি, এসিয়াখণ্ডে ইহার দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান ৩০ বৎসর পূর্ব্বে জাপান কি ছিল, আর আজ কি হইয়াছে, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। যে সমুদয় স্বদেশপ্রেমিক বর্ত্তমান জাপান গঠন করিয়াছেন, তাঁহারা উৎসাহী আশাপ্রদ যুবকবৃন্দকে প্রতীচ্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার নিমিত্ত ইউরোপে পাঠাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তত্তৎদেশীয় পণ্ডিতদিগকে জাপানে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য আনয়ন করেন। বলা বাহুল্য, যদিও উক্ত পণ্ডিতগণ স্বীয় ভাষার সাহায্যেই শিক্ষা প্রদান করিতেন, তথাপি শীঘ্রই সে সমুদয় পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। জাপান নিজের ভাষার আদর বুঝিল; বুঝিল, বৈদেশিক ভাষাতে শিক্ষা কখনও সম্পূর্ণ হইতে পারে না; বুঝিল, মাতৃভাষার সৌষ্ঠবসাধন অবশ্যকর্ত্তব্য।

দেশের দুর্গতি ও দুরবস্থার বিষয় এখন চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই আলোচনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন যে, যত দিন এক দিকে মুষ্টিমেয় শিক্ষিতসম্প্রদায়, এবং অন্য দিকে কোটী কোটী নরনারী অজ্ঞান অন্ধকারে নিমগ্ন থাকিবে, ততদিন আমাদের উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার আশা খুব কম। যাঁহারা ইংরাজীভাষা অবলম্বন করিয়া বিজ্ঞান শিখিতেছেন, তাঁহারা অগাধ জলরাশির মধ্যে শিশিরবিন্দুর ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। মহামতি বাকল ইংলণ্ড ও জর্ম্মান দেশের শিক্ষাবিস্তারের তুলনা করিতে গিয়া দেখাইয়াছেন যে, জর্ম্মান দেশে সর্ব্ববিদ্যায় অসামান্য প্রতিভাশালী লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অথচ রাজনৈতিক উন্নতি বিষয়ে ইংলণ্ড অপেক্ষা পশ্চাৎপদ। ইহার কারণ এই যে, জর্ম্মনদেশীয় পণ্ডিতগণ চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া এমন এক 'পণ্ডিতী' ভাষার সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তাহা কেবল সঙ্কীর্ণ 'গণ্ডী'র মধ্যে সীমাবদ্ধ; সে সমস্ত উচ্চভাব সমাজের নিম্নতর স্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে না। ইহার ফল এই হইয়াছে যে, মুষ্টিমেয় শিক্ষিত-সম্প্রদায় ও জনসাধারণের বোধগম্য অনেক সরল পুস্তক প্রকাশিত হওয়ায় জনসাধারণের মধ্যে তাহার ভাব ও স্থূল মর্ম্ম প্রবেশ করিতে পারিয়াছে। এই প্রকার শ্রেণীগত পার্থক্য আমাদের দেশে অত্যধিক প্রবল। আরও একটি কথা; আমরা এতক্ষণ ইংরাজী-শিক্ষা-প্রাপ্ত ও নীরেট অজ্ঞদলের কথা বলিলাম। ইহার মাঝামাঝি এক দল পড়িয়া রহিলেন। অর্থাৎ, যাঁহারা কেবলমাত্র সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও ব্যাখ্যানে ব্রতী। ইঁহারা কলাপ ও পাণিনি; কালিদাস, মাঘ ও ভারবি; জটিল ন্যায়শাস্ত্র; এতদ্ভিন্ন বেদ ও বেদান্ত প্রভৃতি দর্শন লইয়াই ব্যস্ত। মোটামুটি বলিতে গেলে তাঁহারা ১৫০০ হইতে দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বের ভারতে বাস করেন। ইঁহাদিগকে আমরা অবশ্য আধুনিক শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে গণনা করিতে কুণ্ঠিত হই; কিন্তু আবার ইঁহারাই সমাজে 'পণ্ডিত' উপাধিধারী, এবং ইঁহাদের আধিপত্য জনসাধারণের উপর ব্রিটিশশাসন অপেক্ষা অধিক বিস্তৃত ও কঠোর। এই শ্রেণীকে একেবারে বাদ দিলে চলিবে না।

কেহ কেহ বলিবেন যে, ইংরাজী শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই শ্রেণী লোপ প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু

তাহা ঠিক নয়। গবর্মেণ্ট হইতে 'উপাধি'-প্রদানের যে পরীক্ষা গৃহীত হয়, তাহার 'আদ্য', 'মধ্য' ও 'উপাধি', এই তিন বিভাগে কেবল বঙ্গদেশে প্রতি বৎসর অন্যূন ৪৫০০ পরীক্ষার্থী উপস্থিত হইয়া থাকেন। সমগ্র টোলের ছাত্রসংখ্যা ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক। অতএব দেখা যাইতেছে, বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞানের গ্রন্থ সকল প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইলে এমন সহস্র সহস্র ইংরাজী-অনভিজ্ঞ পাঠকপাঠিকাগণের হাতে পঁহুছিবে, যাহা ইংরাজী ভাষায় লিখিত গ্রন্থের পক্ষে কদাচ সম্ভব নয়। অবশ্য যাঁহারা বিজ্ঞান-চর্চ্চায় জীবন অতিবাহিত করিয়া মৌলিকতত্ত্বের নির্ণয় ও গবেষণায় সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিবেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা ইংরাজী কেন, জর্ম্মণ ও ফরাসী ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলীও পাঠ করিতে বাধ্য হন।

আমাদের বলার উদ্দেশ্য এই যে, যাঁহারা 'শিক্ষিত' বলিয়া অভিহিত, তাঁহাদের বিজ্ঞানের মূল তাৎপর্য্যগুলি জানা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে; অর্থাৎ, আধুনিক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই বিজ্ঞানশাস্ত্রসম্বন্ধীয় সাধারণ বিষয়গুলি মোটামুটি জানা বিশেষ আবশ্যক।

ফল কথা এই যে, আমরা যত দিন স্বাধীনভাবে নূতন নূতন গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়া মাতৃভাষায় সেই সকল তত্ত্ব প্রচার করিতে সক্ষম না হইব, তত দিন আমাদের ভাষার এই দারিদ্র্য ঘুচিবে না। প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া হিন্দুজাতি একপ্রকার মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। যেমন ধনীর সন্তান পৈতৃক বিষয় বিভব হারাইয়া নিঃস্বভাবে কালাতিপাত করেন, অথচ পূর্ব্ব-পুরুষগণের ঐশ্বর্য্যের দোহাই দিয়া গর্ব্বে স্ফীত হন, আমাদেরও দশা সেইরূপ। কেহ কেহ বলেন যে, খৃঃ অঃ দ্বাদশ শতাব্দী হইতে ইয়োরোপখণ্ডে স্বাধীন চিন্তার স্রোত প্রথম প্রবাহিত হয়; প্রায় সেই সময় হইতেই ভারতগগন তিমিরাচ্ছন্ন হইল। অধ্যাপক বেবর (Weber) যথার্থই বলিয়াছেন, ভাস্করাচার্য্য ভারত-গগনের শেষ নক্ষত্র। সত্য বটে, আমরা নব্যস্মৃতি ও নব্যন্যায়ের দোহাই দিয়া বাঙ্গালীমস্তিষ্কের প্রখরতার শ্লাঘা করিয়া থাকি; কিন্তু ইহা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যে সময়ে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর প্রভৃতি মন্থন ও আলোড়ন করিয়া নবমবর্ষীয়া বিধবা নির্জ্জলা উপবাস না করিলে তাহার পিতৃ ও মাতৃ-কুলের ঊর্দ্ধতন অধস্তন কয় পুরুষ নিরয়গামী হইবেন, ইত্যাকার গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন, যে সময়ে রঘুনাথ, গদাধর ও জগদীশ প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণ বিবিধ জটিল টীকা টিপ্পনী রচনা করিয়া টোলের ছাত্রদিগের আতঙ্ক উৎপাদন করিতেছিলেন, যে সময়ে এখানকার জ্যোতির্ব্বিদরন্দ প্রাতে দুই দণ্ড দশ পল গতে নৈঋত কোণে বায়স কা কা রব করিলে সেদিন কিপ্রকার যাইবে, ইত্যাদি বিষয় নির্ণয় পূর্ব্বক কাকচরিত্র রচনা করিতেছিলেন, যে সময়ে এদেশের অধ্যাপকরন্দ 'তাল পড়িয়া ঢিপ করে কি ঢিপ করিয়া পড়ে' ইত্যাকার তর্কের মীমাংসায় সভাস্থলে ভীতি উৎপাদন করিয়া সমবেত জনগণের অন্তরে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা উৎপাদন করিতেছিলেন, সেই সময়ে ইয়োরোপখণ্ডে গ্যালিলিও, কেপ্লার, নিউটন প্রভৃতি মনস্বিগণ উদিত হইয়া প্রকৃতির নূতন নূতন তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক জ্ঞানজগতে যুগান্তর উপস্থিত করিতেছিলেন। তাই বলি, আজ সহস্র বৎসর ধরিয়া হিন্দুজাতি নিঃস্পন্দ ও অসাড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। যাহা হউক, বিধাতার কৃপায় হাওয়া ফিরিয়াছে; মরা গাঙ্গে সত্য সত্যই বাণ ডাকিয়াছে; আজ বাঙ্গালী-জাতি ও সমগ্র ভারত নূতন উৎসাহে, নূতন উদ্দীপনায় অনুপ্রাণিত। যে দিন রাজা রামমোহন রায় বাঙ্গালীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলনই ভবিষ্য ভারতের সমৃদ্ধিসোপান বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, সেই দিনই বুঝি বিধাতা ভারতের প্রতি পুনরায় শুভ দৃষ্টিপাত করিলেন। জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে সকল জাতি পুরাতন আচার, ব্যবহার, জ্ঞান ও শিক্ষা বিষয়ে নিতান্তই গোঁড়া, যাঁহারা প্রাচীন শিক্ষার ও প্রাচীন প্রথার নামে আত্মহারা হন, যাঁহারা বর্ত্তমান জগতের জীবন্তভাব জাতীয় জীবনে সংবেশিত করা হঠকারিতা বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা বর্ত্তমান কালের ইতিহাসে নগণ্য ও মৃতপ্রায়; এমন কি, এই সমস্ত জাতি নূতনের প্রবল সংঘর্ষণে লুপ্ত

হইবার উপক্রম হইয়াছে। এ বিষয়ে কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই যে, বর্ত্তমান ইয়োরোপের শিক্ষা অত্যল্প কাল হইল আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু আমরা ইহা যেন না ভুলি যে, বর্ত্তমান অবস্থায় ইয়োরোপ আমাদিগকে যোজনাধিক পশ্চাতে ফেলিয়া বিজ্ঞান ও সাহিত্যের পূর্ণোন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে। আমার স্বতঃই মনে হয়, আমাদের এই অধোগতির কারণ,—পুরাতনের প্রতি এক অস্বাভাবিক ও অনেক সময়ে অহেতুকী আসক্তি ও অপরাপর জাতির গুণাবলীর প্রতি বিদ্বেষ ও অগ্রাহ্যের ভাব। এ স্থানে অবশ্য স্বীকার্য্য যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের আচার পদ্ধতি ও শিক্ষা অনেক সময়ে বর্ত্তমান সভ্য-জাতিগণের আচার পদ্ধতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল, এবং সে সমুদায়ের প্রতি ভক্তিবিহীন হওয়া মূঢ়তার লক্ষণ, সন্দেহ নাই। কিন্তু কালের পরিবর্ত্তনে অনেক বিষয়ের আমূল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে—যেমন বাহ্যিক জগতে, তেমনই মানসিক রাজ্যে। এ স্থানে প্রশ্নটি একটু বিশদভাবে আলোচনা করা কর্ত্তব্য। আমি আশঙ্কিত হইতেছি, পাছে কাহারও মনে অপ্রীতি সঞ্চার করিয়া ফেলি; কিন্তু যদি স্বাধীনচিন্তা মানবমাত্রেরই পৈতৃক সম্পত্তি হয়, তাহা হইলে আমাকে বলিতেই হইবে যে, পরকীয় শিক্ষা ও জ্ঞানের গ্রহণেচ্ছা আমাদের আদৌ নাই; যদি থাকিত, তাহা হইলে অন্ততঃ বিজ্ঞান বিষয়ে বর্ত্তমান ইয়োরোপ ও আমেরিকা আমাদের অনুকরণীয় হইত। এই প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য শিক্ষার সংমিশ্রণের উপরেই, আমার মতে, ভাবী ভারতের সমৃদ্ধি নির্ভর করিতেছে। যে জাপান ত্রিংশ বর্ষ পূর্ব্বে ঘোরতমসাচ্ছন্ন ছিল, জগতে যাহার অস্তিত্ব (ঐতিহাসিক হিসাবে) সন্দেহের বিষয় ছিল, সেই জাপান পাশ্চাত্য শিক্ষা জাতীয় শিক্ষার সহিত সংযোজিত করিয়া আজ কি এক অভিনব ক্ষমতাশালী জাতি হইয়া আসিয়ার পূর্ব্ব প্রান্তে বিরাজ করিতেছে!

এখন জ্ঞানজগতে যেমন তুমুল সংগ্রাম, পার্থিব জগতেও ততোধিক। নূতনের দ্বারা পুরাতনের সংস্কার করিতেই হইবে; নচেৎ ভয় হয়, ভারত-ভাগ্যরবি প্রভাতাকাশে উঠিয়াই অস্তমিত হইবে।

এখন বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে আমরা কিছু আলোচনা করিব। জাপানীরা জর্ম্মনি ও রুশিয়ার ন্যায় যাবতীয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব মাতৃভাষায় প্রচার করিতে সক্ষম হন নাই। তাঁহারা মধ্যপথ অবলম্বন করিয়াছেন; অর্থাৎ, মৌলিক গবেষণাসমূহ ইংরাজি ও জর্ম্মান ভাষায় প্রকাশিত করেন, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে যাহাতে বিজ্ঞানের নানাবিধ মূলতত্ত্ব প্রচারিত হইতে পারে, তজ্জন্য মাতৃভাষা অবলম্বন করিয়াছেন। ইয়োরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে ভাষাগত পার্থক্য থাকিলেও, বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রায় একই; সমস্ত বৈজ্ঞানিক জগতে একই পরিভাষা হইলে কত দূর সুবিধা হয়, তাহা নির্ণয় করা যায় না। জাপানীরা এই সুবিধাটুকু হৃদয়ঙ্গম করিয়াই মধ্যপথ অবলম্বন করিয়াছেন। আমাদেরও তাহাই অবলম্বনীয়; কেন না, উক্ত জাতির অবস্থার সহিত আমাদের অবস্থার বিশেষ সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান।

ইতিমধ্যে বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সৃষ্টি সাহিত্য-সম্মিলনের একটি প্রধান কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আহ্লাদের বিষয়, কয়েক বৎসর যাবৎ সাহিত্য-পরিষৎ এ বিষয়ে যত্নবান হইয়াছেন, এবং শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় প্রভৃতি মহোদয়গণ তজ্জন্য পরিশ্রম করিতেছেন। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় সাময়িক পত্রিকায় যে সকল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন, তাহাতেও এ বিষয়ে সহায়তা হইতেছে। নাগরী প্রচারিণী সভা ভূগোল, খগোল, অর্থনীতি, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা প্রভৃতি ঘটিত বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সংকলন করিয়াছেন। পরলোকগত জগন্নাথ স্বামী তেলেগু ভাষায় রসায়নশাস্ত্রবিষয়ক একখানি পুস্তক প্রচার করিয়াছেন, এবং তাহাতে সংস্কৃত-মূলক অনেক পরিভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। সম্প্রতি বার্ণেকুলার টেক্‌ষ্টবুক কমিটি বাঙ্গালা বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সংকলন করিয়াছেন, এবং আশা করা যায়, সাহিত্য-সম্মিলনও এই অধিবেশনে একটি বিশেষজ্ঞের সমিতি (committee of experts) নিয়োজিত করিয়া কি ভাবে পরিভাষা গৃহীত হইবে, তাহার নিষ্পত্তির উপায়-বিধান করিবেন।

বর্ত্তমান সাহিত্য-সম্মিলনের অনুষ্ঠাতৃগণ বাঙ্গালা সাহিত্যকে সাধারণ সাহিত্য ও বৈজ্ঞানিক সাহিত্য, এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া শেষোক্ত বিভাগের কার্য্যক্ষেত্র British Association for the Advancement of Learning and Science (ইংলণ্ডের জ্ঞান-বিজ্ঞানোন্নতি সভা) এর আদর্শে যে অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, তাহা সদ্‌যুক্তি বলিয়া বোধ হয়। মানবতত্ত্ব (Anthropology পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস, লোকতত্ত্ব (Ethnology), ভূগোল পদার্থ-বিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, ভূবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা হইয়া যাহাতে তত্তৎ বিষয়ক গ্র বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত হয়, তজ্জন্য আমাদিগকে সচে হইতে হইবে। আশা করি, এই অধিবেশনে রাজসাহ বিভাগের লোকতত্ত্ব সম্বন্ধে দুই একটি সারবান প্রবন্ধ পঠিত হইয়া ইহার সূচনা হইবে। অত্যন্ত আহ্লাদে বিষয় এই যে, রাজসাহীর কয়েক জন কৃতবিদ্য সন্তা পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাস বিষয়ে নূতন পথ দেখাইয়া আমাদে

আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও সম্মানের পাত্র হইয়াছেন। বাঙ্গালী যে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া ইতিহাস রচনা করিতে সক্ষম, সিরাজদ্দৌলা-প্রণেতা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তাহার সাক্ষ্যপ্রদান করিয়াছেন। আমার বন্ধু, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার ইয়োরোপ ও ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে বহু দুর্লভ পারসী পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং সেই সকল মন্থন করিয়া রত্নাবলী আহরণ করিতেছেন। তিনি যে সমুদয় বিবরণ লিখিতেছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আমি অনেক সময়ে আত্মবিস্মৃত হইয়াছি, এবং আপনাকে কল্পনায় অনেক সময়ে ঔরঙ্গজেব বাদশাহের সমকালীন বলিয়া মনে করিয়াছি। তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া এইরূপ মহৎকার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন, এবং মোগলরাজ্যের বিশাল ইতিহাস লিখিয়া মাতৃভাষার সৌষ্ঠব সাধন করেন, ঈশ্বরের নিকট ইহাই আমাদিগের আন্তরিক প্রার্থনা। আমাদিগের সম্মিলনের একজন প্রধান উদ্‌যোক্তা শ্রীযুত শশধর রায় মহাশয় "মানবসমাজের ক্রমবিকাশ" প্রভৃতি শীর্ষক যে সকল প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি অভাব মোচন হইবার সূচনা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্ন্যাল বহু পরিশ্রমে মুসলমান বৈষ্ণবদিগের প্রাচীন পদাবলী সংগ্রহ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের মহদুপকার সাধন করিয়াছেন।

আজ আমরা নূতন জাতীয় জীবনের প্রাসাদের প্রথম সোপানে দণ্ডায়মান। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যে দেশে 'জাতীয় জীবন' ইত্যাদি আশা ও উৎসাহের কথা, অলীক ও কবি-কল্পনা-প্রসূত উন্মাদোক্তি বলিয়া বিবেচিত হইত, যে দেশে স্বদেশপ্রেম বলিয়া কথা বহু শতাব্দী যাবৎ বিস্মৃত ছিল, যে দেশ মাতৃভাষা ভুলিয়া এতদিন বৈদেশিক ভাষাকে শিক্ষা ও জ্ঞানের দ্বার বিবেচনা করিত, সেই দেশে আজ কি এক অপূর্ব্ব ভাব আসিয়া মৃত প্রাণে কি এক অমৃতবারি সেচন করিয়া সঞ্জীবিত করিল! যে যুবকগণের কাষ্ঠহাসি দর্শনে পূর্ব্বে আশঙ্কার উদ্রেক হইত, যে দেশের প্রৌঢ়গণের মিতব্যয়িতা আত্মপ্রবঞ্চনামূলক বলিলেও অত্যুক্তি হইত না, আজ কি এক অপূর্ব্ব ঈশ্বরপ্রেরিতভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সেই যুবক সরসপন্দনে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল, সেই প্রৌঢ় ব্যক্তি লোকসেবায়, জাতীয় শিক্ষায় অকাতরে বহুকষ্টসঞ্চিত অর্থ নিয়োগ করিল! ইহা কি আশার কথা নহে,—ইহা ভাবিলেও কি প্রাণে শক্তি সঞ্চারিত হয় না? দুই বৎসর পূর্ব্বে যে বাঙ্গালী যুবক পিতামাতার স্নেহক্রোড় ত্যাগ করিয়া, অথবা নবপরিণীতা ভার্য্যাকে ছাড়িয়া বৈদেশিক বিজ্ঞান ও সাহিত্য অধ্যয়নের জন্য সুদূরদেশে যাইতে কুণ্ঠিত হইত, আজ জানি না, কি এক অদৃষ্টপূর্ব্ব, অচিন্ত্যপূর্ব্ব, অশ্রুতপূর্ব্ব ভাবে প্রোৎসাহিত হইয়া জন্মভূমিকে গৌরবান্বিত করিতে সেই যুবক বিদেশ যাত্রা করিল! তাই বলিতেছিলাম, আমরা জাতীয় জীবনের সোপানে আজ দণ্ডায়মান—আজ নূতন আশা, নূতন উদ্দীপনার দিন।

বাঙ্গালায় এমন দীন হীন কাঙ্গাল হতভাগ্য কে আছ ভাই, যে আজ বিধাতার মঙ্গলময় আহ্বানে আহূত হইয়া মাতৃভূমির ও মাতৃভাষার আরতির জন্য নৈবেদ্যোপচার লইয়া সমুপস্থিত না হইবে? ধনী! তুমি তোমার অর্থ লইয়া, বলী! তুমি তোমার বল লইয়া, বিদ্বান! তুমি তোমার অর্জ্জিত বিদ্যা লইয়া, সকলে সমবেত হও।

আজ আমরা যুগসন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান। সমস্ত ভারত আজ আমাদিগের দিকে সোৎসাহনেত্রে চাহিয়া রহিয়াছে; স্বর্গ হইতে পিতৃপুরুষ আমাদের কার্য্যাবলী লক্ষ্য করিতেছেন। আজ আমরা জাতীয় জীবনের এমন এক স্তরে দণ্ডায়মান, যেখানে আমাদের সম্মুখে দুইটিমাত্র পথ, একটি অনন্ত অমরত্বের, অপরটি অনন্ত অকীর্ত্তির, মধ্যপথে আর কিছুই নাই। আজ যদি আমরা তুচ্ছ আয়েসে মজিয়া ভবিষ্যৎ-প্রেরিত এই মহাভাব উপেক্ষা করি, ভবিষ্যৎ বংশাবলী আমাদিগকে বিশ্বাসঘাতক উপাধিতে কলঙ্কিত করিবে; ভারতাকাশের উদীয়মান রবি উষার উন্মেষেই হায়, আবার অস্তমিত হইবে।

কিন্তু আজ আশার দিন, আজ উদ্দীপনার যুগ। বাঙ্গালা এ আহ্বান উপেক্ষা করে নাই—সতীশচন্দ্র ও রাধাকুমুদের ন্যায় বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী যুবক, সুবোধচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রকিশোর, সূর্য্যকান্ত, মণীন্দ্রচন্দ্র, তারকনাথ, যোগেন্দ্রনারায়ণ প্রভৃতি ধনাঢ্যগণ যে দেশের জাতীয় শিক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর ও মুক্তহস্ত, সে দেশ নিশ্চয়ই উঠিবে—সে দেশের ভাষা ও বিজ্ঞান কখনই উপেক্ষিত থাকিবে না। যাহাতে অধীতবিদ্য বিজ্ঞানবিদ্‌ ছাত্রগণ বৃত্তি লাভ করিয়া অন্নচিন্তা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, এবং অনন্যমনে বিজ্ঞানচর্চ্চায় নিযুক্ত থাকিয়া বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা

দেশের সেবায় মনঃপ্রাণ নিয়োগ করিতে পারে, এমন উপায় নির্দ্ধারণ করুন। সৌভাগ্যক্রমে এখন কৃতবিদ্য ও নিষ্ঠাবান ছাত্রের অভাব নাই। তাহারা বিলাসবিভ্রমের প্রত্যাশী নহে; যাহাতে তাহাদের সাংসারিক অভাবমোচন হয়, এবং তাহারা একান্তমনে বিজ্ঞানসেবায় ব্রতী হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করুন। জ্ঞান জাতীয় জীবনের উৎস। এই উৎসের পরিপুষ্টিসাধনের জন্য আবার ভারতে নিষ্কাম জ্ঞানচর্চ্চা প্রবর্ত্তিত হউক।

বাল্য-বিবাহ।

বাল্য-বিবাহ এবং বালবিধবাদিগের সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে বিবাহ সম্বন্ধে হিন্দুদিগের মত মোটামুটি জানা আবশ্যক। স্বামীর নিকট স্ত্রীর বাধ্যতা এবং মাতৃত্ব, বর্ত্তমান সময়ে ইহাই হিন্দুবিবাহের প্রধান কথা। প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দুসমাজে স্ত্রী স্বামীর সখী নহে। পুত্রের জন্য ভার্য্যার প্রয়োজন, সেই পুত্র শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিয়া শুধু যে পিতারই আত্মার কল্যাণ করিবে, তাহা নয়, পূর্ব্বপুরুষদের আত্মারও কল্যাণ করিবে—ইহাই হিন্দুদিগের বিশ্বাস। এক কথায় বলিতে গেলে, স্বামীর পত্নী হওয়া এবং সন্তানের জননী হওয়া, ইহাই যেন হিন্দুনারীর নিয়তি—আর যেন জীবনে তাহার কোন লক্ষ্য নাই।

হিন্দুদিগের বিবাহ-বিধি মনু-সংহিতা হইতে গৃহীত। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সমাজ-সংস্কারকগণ বলেন, মনুর মতে কন্যাকে পরিণত বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা রাখা যাইতে পারে। প্রাচীন ইতিহাসের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া তাঁহারা দেখাইয়া থাকেন যে, প্রাচীন কালে হিন্দুনারীর অবস্থা আরো উন্নত ছিল এবং জোর করিয়া বৈধব্যপালন প্রচলিত ছিল না। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিতে হইলে বর্ত্তমান অবস্থা জানা আবশ্যক। মনু-ধর্ম্মশাস্ত্র অপেক্ষা আধুনিক শাস্ত্রের ব্যবস্থা এই যে, দশ বৎসরের পরে কন্যার বিবাহ দিলে মহাপাতক ভোগ করিতে হয় এবং নরহত্যা-পাপে পাপী হইতে হয়। সহস্র সহস্র পিতামাতা এই মতে প্রগাঢ় আস্থা স্থাপন করেন এবং কন্যার বিবাহ বিলম্বে দিলে মহাপাপে পাপী হইবেন, এরূপ বিশ্বাস করেন।

এই দুই প্রকার বিধির মধ্যে প্রথমোক্ত বিধিটী বেদ হইতে সমাগত বলিয়া কথিত। এই মত বর্ত্তমান কালের বিজ্ঞানশাস্ত্রের অনুমোদিত এবং এই বিধি অনুসারে বাল্যবিবাহ প্রকৃতির নিয়মের বিরোধী ও জাতি এবং ব্যক্তিবিশেষ উভয়েরই অনিষ্টকারী। দ্বিতীয় বিধিটী—শাস্ত্রবিধি—তাহা হইলে, বেদ-সম্মত নহে। যদি এই দুই বিধির যে-কোনটী পালনে হিন্দুর স্বাধীনতা থাকে, তবে কোন্ বিধি পালনীয় নিশ্চয়ই উচ্চতর যুক্তি তাঁহার মীমাংসা সহজ করিয়া দিবে। এক জন ভারতীয় সংস্কারক, তাঁহার স্বদেশবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, 'শাস্ত্রের প্রকৃত ভাবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহা পালন কর।' যদি ব্রাহ্মণ ও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেতর হিন্দুগণ এই ভাবে শাস্ত্রের ভাবার্থ গ্রহণ করিতেন তবে বাল্যবিবাহের প্রধান অন্তরায় দূর হইতে পারিত। কারণ বাল্যবিবাহ হিন্দুর ধর্ম্মবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহারা নিষ্ঠুর নহে, কিন্তু যাহা তাহারা ধর্ম্মের বন্ধন বলিয়া মনে করে, তাহার জন্য ভবিষ্যতের নিকট বর্ত্তমানকে বলি দিতে তাহারা কুণ্ঠিত নহে,—নিজের অথবা স্বজনের তাহাতে যতই ক্ষতি হউক না কেন। বাল্যবিবাহের অশেষ দোষের মধ্যে দুই তিনটী মাত্র এ স্থানে উল্লেখ করিব।

এই প্রথা অনুসারে বিবাহিত বালিকাগণকে আজীবন যে শারীরিক কষ্ট সহ্য করিতে হয় তাহা বর্ণনা করা অনাবশ্যক। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ৫৫ জন লেডি ডাক্তার এই সকল বালিকার অনেকের কষ্ট স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া গবর্ণর জেনেরাল মহোদয়ের নিকট অনুনয় সহকারে আবেদন করেন যে, আইন করিয়া বালিকার বিবাহের বয়স ১৪ বৎসর নির্দ্দিষ্ট করা হউক। এই কুপ্রথা অবর্ণনীয় যন্ত্রণার আকর। সকল কথা বলা যায় না, হতভাগিনী বালিকাগণকে তাহা নীরবে সহিতে হয়।

বাল্যবিবাহ শিক্ষার এক প্রধান অন্তরায়। ঘোর দারিদ্র্য বৃদ্ধি এবং জাতীয় শারীরিক ও মানসিক দুর্গতির

ইহা এক প্রধান কারণ। এই প্রথা প্রচলিত থাকাতেই বাল্য-বিধবার সংখ্যা এত অধিক। গত সেন্সাস্ বা লোক-সংখ্যা গণনায় দেখা গিয়াছে, এক বৎসরের ন্যূন বয়স্কা ৫৩৮টী খুকী বিধবা হইয়াছে। এই সকল বালবিধবার জীবনব্যাপী দুঃখ কষ্টের অবধি নাই। যে সকল নিরপরাধিনী শিশু এই কুপ্রথার ফলে বিধবা হয়, তাহাদের সম্বন্ধে মহাকবি দান্তের উক্তি "All hope abandon ye who enter here" (এখানে যাহারা প্রবেশ করিতেছ তাহারা সকল আশা ভরসা পরিত্যাগ কর)—সম্পূর্ণ প্রয়োজ্য। যখন গবর্ণমেণ্ট সতীদাহ নিবারণ করিলেন তখন লোকে মনে করিয়াছিল, নারীদিগের সম্বন্ধে যাহা প্রয়োজন সকলই করা হইল কিন্তু বস্তুতঃ সতীদাহ নিবারণ করিয়া সংস্কারের এক ধার মাত্র স্পর্শ করা হইয়াছে। সতীরা আগুণে পুড়িয়া মরিতেন, বালবিধবারা রুদ্ধগৃহে লোকচক্ষুর অন্তরালে চিরদিন দগ্ধ হয়।

এই সকল কুফল নিবারণের জন্য কি করা হইয়াছে? ইংরাজগণ যখন ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন তখন তাঁহারা এই প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হন, যে তাঁহারা ভারতবাসীর সামাজিক রীতি ও ধর্ম্মের উপর কিছু মাত্র হস্তক্ষেপ করিবেন না। প্রায় ৭৫ বৎসর কাল এই প্রতিশ্রুতি তাঁহাদের হস্তপদ আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা যখন দেখিলেন, যে এই সকল সামাজিক প্রথা ও ধর্ম্মবিধি অনেক নৃশংসতা ও প্রণালীবদ্ধ শিশু হত্যার কারণ, তখন তাঁহাদের বিবেক উদ্বুদ্ধ হইল। কারণ যদিও একদিকে প্রতিশ্রুতি, তেমনি অন্যদিকে বিধবা ও বালিকাগণ রাজ্যেরই প্রজা, রাজারই রক্ষণীয়। তখন তাঁহারা আইনের এই ব্যাখ্যা করিলেন যে, মানব জীবন নাশের যেখানে সম্ভাবনা, সে স্থলে তাঁহারা আইন পালন করিতে বাধ্য নহেন। কারণ মানব জীবন রক্ষা করা আইনের শ্রেষ্ঠতর কর্ত্তব্য।

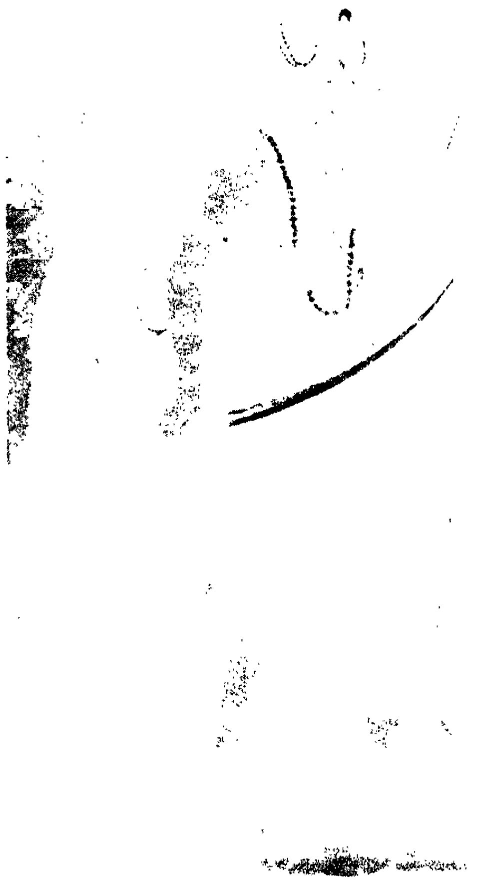
এখন জিজ্ঞাস্য, এই ব্যাখ্যা কি বাল্যবিবাহ এবং বালবিধবাদের সম্বন্ধেও প্রয়োজ্য হইতে পারে না? দেশের লোক এজন্য প্রস্তুত নয়, এই বলিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের দায়িত্ব এড়াইতে চেষ্টা করিতে পারেন, কিন্তু আমরা জানি, শিক্ষিত হিন্দুগণের অনেকেই, গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে অত্যন্ত সুখী হন। হিন্দুগণ উন্নতচরিত্র হইলেও বিশ্বাসানুযায়ী নূতন সংস্কার কার্য্যে পরিণত করিতে তাঁহাদের মানসিক বলের অভাব আছে—অবশ্য সকলের সম্বন্ধে এ কথা প্রয়োজ্য নহে। এ বিষয়ে লোকের মন আন্দোলিত হইতেছে,তাহারা কাজ করিতে চেষ্টা করিতেছে। মান্দ্রাজের হিন্দুসভা বিবাহ সংস্কার সম্বন্ধে বিশেষ আন্দোলন করিতেছেন। বোম্বায়ে 'প্রেসিডেন্সী রিফর্ম এসোসিয়েসন' ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে পর্দানসিন মহিলাদিগের এক সভা আহ্বান করিয়া ভারতবর্ষের নারীদিগের সম্বন্ধে নানা বিষয়ে তাঁহাদের অভিপ্রায় জানিতে চাহিয়াছিলেন। সেই সভাতে বাল্যবিবাহের কুফল ও বিধবাগণের কষ্টের বিষয় মহিলাগণ আলোচনা করিয়াছিলেন। মহীশূর ও বরদারাজ্যে বিবাহের বয়স বৃদ্ধি বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। মান্দ্রাজে ও বোম্বায়ে বিধবার পুনর্ব্বিবাহের জন্য সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার ফল যদিও বেশী হইতেছে না, অতি ধীরে কাজ হইতেছে, তথাপি শিক্ষিত লোকের অভিপ্রায় বুঝিতে পারা যাইতেছে। উদাসীনতা অপেক্ষা এই সামান্য চেষ্টা দশ গুণে শ্রেষ্ঠ। কলিকাতায় কিছুদিন হইল দুইটী বিখ্যাত বিধবাবিবাহ হইয়া গিয়াছে। কলিকাতায় শিশুর প্রতি অত্যাচার-নিবারিণী সভা দ্বারাও অনেক কাজ হইতেছে। বোম্বাই এবং পুনাতেও এই সমিতির শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

নারীগণের সম্বন্ধে পুরুষজাতির ধারণা সুসংস্কৃত না হইলে নারীর অবাধ উন্নতি ও সুশিক্ষালাভ সুকঠিন। পুরুষগণ যদি বিশ্বাসানুযায়ী কাজ করিতে সক্ষম না হন তবে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনাই ভাল।

যাঁহাদের উপর এ সকল বিষয়ে প্রকৃত দায়িত্ব রহিয়াছে, ভগবান তাঁহাদের বিবেক উদ্বুদ্ধ করুন। *

---

* ইংলণ্ডে 'প্যান এঙ্গলিক্যান কংগ্রেসের' অধিবেশনে শ্রীমতী হাচেজ কর্ত্তৃক পঠিত প্রবন্ধের মর্ম্ম।



শমীবৃক্ষতলে অর্জ্জুনের রণসজ্জা।

By favour of the Editor,
Saralkasiam.

ART PRESS

ধর্ম্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠা।*

শরৎকাল চলিয়া গিয়াছে। শীতের সমাগমে তরু লতা গৈরিক বসনে সাজিয়াছে। প্রতিজ্ঞা-গ্রহণকারীগণ মদ্যের বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রাম করিতেছেন। তাঁহাদের সংকল্প, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ হইতে এই পাপ দূর করিবেনই করিবেন। কলিকাতায় এবার মদের লাইসেন্‌স লইতে প্রায় কেহই গেল না। নারায়ণ রাওএর সেবাক্ষেত্র এই পিশাচের কবল হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করিল। কলিকাতার অন্যান্য মদের দোকানও উঠিয়া গেল। কেবলমাত্র তিন জন লাইসেন্‌স গ্রহণ করিল।

মদ্য-বিক্রেতারা এই পাপ-ব্যবসায় ছাড়িয়া দিয়া অনেকেই পল্লীগ্রামে গমন করিল। তাহারা সোণার বাংলার সোণার ক্ষেত্রে সোণার ফসল উৎপন্ন করিয়া জীবন নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। অনেক দিন পরে তাহারা বিমল আনন্দ ও শান্তি লাভ করিল।

দেশের সুসন্তানগণ এই সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া সকল সংগ্রামের অবসান হইল বলিয়া বিশ্রাম-সুখে রত হইলেন না, কারণ তাঁহারা জানিতেন সম্মুখে এখনও বিশাল সংগ্রামক্ষেত্র প্রসারিত। এখনও এইরূপ অসংখ্য শত্রুকে নিপাত করিলে তবে দুঃখিনী জন্মভূমির চরণের শৃঙ্খল খসিয়া পড়িবে। এখন সমরাঙ্গণে পদার্পণ করিয়াছেন মাত্র। এখনই আনন্দে উৎফুল্ল হইবার সময় আসে নাই এবং নিরাশারও কোন কারণ নাই। তাঁহারা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া প্রশস্ততর সংগ্রামের সম্মুখীন হইবার জন্য বল ভিক্ষা করিলেন। নলিনী, সরলা এবং সুধীর তাঁহাদের কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। জাতীয় বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহারা হিন্দু, মুসলমান, ধনী দরিদ্র সকলের বাড়ী যাইয়া ছাত্রী সংগ্রহ করিয়াছেন। সেখানে এখন শতাধিক বালিকা শিক্ষালাভ করিতেছে।

নলিনী এবং সুধীর একটি ছোট বাড়ীতে অতি সামান্য ভাবে সুখে বাস করিতেছেন। তাঁহাদের আগেকার বাড়ীতে প্রায় সত্তর জন অসহায়া রমণী বাস করিতেছে। তাহারা যাহাতে আত্মোন্নতি করিয়া পবিত্র ধর্ম্মজীবন লাভ এবং জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে, তাহাদের এরূপ শিক্ষার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। শিক্ষালাভ এবং গৃহকর্ম্ম করিয়া যে সময়টুকু থাকে তাহা যাহাতে বৃথা যায় না হয় এই জন্য নলিনী তাহাদের চরকায় সূতা কাটিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। তাহারা দেশের জন্য এবং নলিনীকে সুখী করিবার জন্য সানন্দে এই কাজ করিতেছে। নলিনীকে সুখী করিবার জন্য কোন কাজ করিতে পাওয়া তাহাদের পক্ষে এক মহা সুযোগ।

শীতকাল প্রায় চলিয়া গিয়াছে। কলিকাতার ব্রাহ্ম-সমাজ মন্দিরে প্রতিজ্ঞা গ্রহণের সেই স্মরণীয় দিনের এক বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। রবিবার—যে দিনে প্রতিজ্ঞা-গ্রহণের এক বৎসর পূর্ণ হইল সে দিন ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয় দিন। এই এক বৎসরে প্রতিজ্ঞা-গ্রহণকারীরা দেশে যে মহা পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছেন তাহার গুরুত্ব তাঁহারা নিজেরা ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে পারিতেছিলেন না।

পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক এবং আচার্য্য শ্রীযুক্ত পরেশনাথ ভট্টাচার্য্য কয়েক সপ্তাহের জন্য কলিকাতায় আসিয়াছেন। তিনি মন্দিরের দুই রবিবারের উপাসনায় উপস্থিত ছিলেন। এই রবিবার উপাসনার পর বাড়ী ফিরিয়া তিনি তাঁহার কোন বন্ধুকে এই চিঠি লিখিলেন :—

"প্রিয় প্রভাত,

অনেক রাত হয়েছে ; কিন্তু আমি আজ যা দেখ্‌লাম এবং শুন্‌লাম তাতে আমার হৃদয় এত উদ্বেলিত হয়ে উঠছে যে, সে বিষয় তোমাকে এখনি কিছু না লিখে আমি পারলাম না।

---

* গত বৈশাখ মাসের ভারত-মহিলায় "ধর্ম্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠা" আরম্ভ হইয়াছিল, মাঘ পর্য্যন্ত ৯টা অধ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। ফাল্গুন ও চৈত্রে এক একটী অধ্যায় প্রকাশ করিলে আগামী বৎসরের জন্য আর তিনটী অধ্যায় থাকে। এই তিনটী মাত্র অধ্যায়ের জন্য এই গল্পটী আগামী বৎসরে জের টানিয়া নিলে কোন কোন পুরাতন গ্রাহক—যাঁহারা আগামী বৎসর গ্রাহক থাকিতে ইচ্ছা করেন না—এবং নূতন গ্রাহকগণের প্রতি অবিচার করা হইবে। এজন্য আমরা কোন কোন শাখা প্রশাখা বাদ দিয়া মূল গল্পটী চৈত্রের সংখ্যায় শেষ করিব। ইহাতে মূল গল্পের সৌন্দর্য্য হানির আশঙ্কা নাই। ভাঃ মঃ সঃ।

অমরেন্দ্রনাথ সেনকে তুমি চেন। আমরা সবাই এক সঙ্গে পড়্‌তাম। তুমি আমাকে গতবারে বলেছিলে যে কলেজ থেকে বেরিয়ে তাঁহার সঙ্গে আর তোমার দেখা হয় নাই।

এক বৎসর আগেও তাঁর জীবন সাধারণ ভাবে কেটে যাচ্ছিল। তিনি মন্দিরে উপাসনা করতেন, উপদেশ দিতেন এবং সেখানেই তাঁর কর্ত্তব্য শেষ হ'ল মনে করে সচ্ছন্দে জীবন কাটাতেন। কিন্তু ঠিক এক বৎসর আগে এইদিনে মন্দিরের উপাসনার পর তিনি অনেকের সঙ্গে এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছিলেন, 'দৈনিক জীবনের প্রত্যেক কার্য্যের আগে মহাপুরুষেরা কি করতেন, এই প্রশ্ন করে এবং যা উত্তর পাব ফলাফল নিরপেক্ষ হয়ে সেই অনুসারে কাজ করব।'

এর ফল এত আশ্চর্য্য হয়েছে যে, তুমি জানই সমগ্র দেশবাসীর মন এ দিকে আকৃষ্ট হয়েছে।

অমরেন্দ্র বল্‌লেন, প্রথম দিনই অনেকে তাঁর এই আহ্বানের আশাতীতরূপ প্রত্যুত্তর দান করেছিলেন। সমাজের অনেকেই এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে 'দৈনিক' পত্রের সম্পাদক অরবিন্দ সেন সংবাদপত্রজগতে এক নব যুগ আনয়ন করেছেন। কালীমোহন গুপ্ত কলিকাতার একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী; নবীনচন্দ্র দাস রেলওয়ে বিভাগে কাজ করতেন, কর্ত্তব্য বোধে সে কর্ম্ম ত্যাগ করেছেন; কুমারী নলিনী রায় এক ধনীর কন্যা। তাঁর সমস্ত টাকাকড়ি তিনি দেশের জন্য উৎসর্গ করেছেন। কুমারী সরলা বসু—তাঁর গানের সুখ্যাতি এখন দেশব্যাপী হয়ে পড়েছে। তিনি তাঁর এই শক্তি সহরের সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখী, পাপী নরনারী যারা তাদের কাজে লাগিয়েছেন! এঁরা সকলেই সেই প্রথম দিন প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন।

এই সব সুপরিচিত ব্যক্তি ছাড়া প্রতিজ্ঞা-গ্রহণকারীর সংখ্যা দিন দিনই বাড়্‌ছে। এই প্রতিজ্ঞা-গ্রহণের পর থেকে কত গৃহের দৈনিক জীবনে যে কত মহা পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে এবং হচ্ছে তার খবর কে রাখ্‌তে যায় প্রভাত?

তুমি বোধ হয় প্রথমেই জিজ্ঞাসা করবে, 'এর ফল কি হয়েছে? এ প্রতিজ্ঞা ব্রাহ্মসমাজের ও দেশের কোন্ উন্নতি সাধন করেছে?'

এর ফল কি হয়েছে তা সংবাদ-পত্রাদি পাঠ করে তুমি কিছু জান। কিন্তু সব জান্‌তে হলে মহাপুরুষদের অনুসরণে এই সকল ব্যক্তিগত জীবনের যে পরিবর্ত্তন হয়েছে তা এখানে এসে দেখে যে'তে হয়। সে সব লিখ্‌তে গেলে একটি দীর্ঘ গল্প লিখ্‌তে হয়। গল্প লেখবার মত অবস্থা আমার নয়, তুমি জান। কিন্তু এই কয়দিন আমি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, তা সংক্ষেপে তোমার কাছে লিখ্‌তে পারি।

সর্ব্ব প্রথম অমরেন্দ্র নাথের পরিবর্ত্তন অতি আশ্চর্য্য। আমি চার বছর আগে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজে তাঁকে উপাসনা করতে শুনেছিলাম। সুমধুর শব্দ-বিন্যস্ত সুললিত ভাষায় তিনি উপাসনা করতেন। তাতে তিনি সাধারণের নিকট সুখ্যাতি অর্জ্জন করতে সমর্থ হতেন, সন্দেহ নাই। গত রবিবার মন্দিরে তাঁর অনুরোধে আমি উপাসনা করেছিলাম। চার বছর পর আজই প্রথম তাঁর উপাসনা শুন্‌লাম। তাঁর উপাসনার কথা কি বল্‌ব—তিনি সে মানুষই ন'ন! উপাসনার বর্ণনা আমি করতে পারি না, তবে শুধু এই বল্‌তে পারি, তাঁর উপাসনা আমায় আজ কাঁদিয়েছে। মন্দিরের আরও অনেক নরনারীকে আজ অশ্রু-বিসর্জ্জন করতে হয়েছিল। তাঁকে দেখে মনে হয় যেন তাঁকে এক মহাবিপ্লব অতিক্রম করে আস্‌তে হয়েছে। তাঁর পূর্ব্বের উপাসনা ও এখনকার উপাসনা তুলনা করে দেখ্‌লে বোধ হয় যেন দুই বিভিন্ন লোকবাসী ব্যক্তির উপাসনা। তাঁর জীবনের অনেক চিন্তা, কার্য্য এবং অভ্যাস সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হয়ে গিয়েছে।

তার পর, নবীন বাবুর কথা বলা যেতে পারে। তিনি তাঁর উচ্চপদ ছেড়ে দিয়ে শিক্ষকতার কাজ করছেন। এতে তাঁর পরিবারের মেয়েরা আর জনসমাজে মুখ দেখান না। এ তাঁর প্রতিজ্ঞারই ফল।

কিংবা, অরবিন্দ বাবুর কথা ধর। তিনি প্রতিজ্ঞাপালন করতে তাঁর সমস্ত অর্থ নিঃশেষ করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন, আর করেছিলেনও। তার পরে কোন সহৃদয় বন্ধুর

দানে তাঁর কাগজ চালাতে সক্ষম হয়েছিলেন। আজ তিনি আমাকে বল্‌লেন তাঁর কাগজের গ্রাহকসংখ্যা এখন দিন দিনই বাড়ছে। কাগজের ভবিষ্যৎ কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত আশাশীল।

তার পরে কালীমোহন বাবু। তাঁর কার্য্যক্ষেত্রে তিনি যুগান্তর সৃষ্টি করেছেন। তাঁর অধীনে যত কেরাণী থেকে মুটে মজুর ইত্যাদি কাজ করে তাদের তিনি কি এক মন্ত্রে বশ করে রেখেছেন! এই শীতকালে তাঁর কঠিন পীড়া হয়েছিল। তখন এই সব মুটে মজুরেরা অবসর হলেই তাঁর ঘরের দরজায় গিয়ে, তাঁর একটু সেবা করবার জন্য, তিনি কেমন আছেন জান্‌বার জন্য তৃষিতের ন্যায় বসে থাকত। তার পর তিনি যখন আবার ভাল হয়ে কাজে গেলেন, তখন তাদের কি আনন্দ! তাদের চরিত্র একেবারে সংশোধিত! এই সংশোধনের মূলমন্ত্র 'ভালবাসা।' বাইরের লোক এসবকে ঠাট্টা করতে পারে, কিন্তু এর মধ্যে কি রয়েছে তা তুমি দেখ্‌ছ না প্রভাত?

আর সরলা বসু আর নলিনী রায়। এঁরা কি করছেন! এঁদের সুন্দর, পবিত্র জীবন এঁরা দেশের দুঃখী পতিতদের জন্য অর্পণ করেছেন। এটা বোধ হয় আমার পক্ষে বলা বলা অসঙ্গত হবে না প্রভাত, যে কিছুদিনের মধ্যেই কুমারী সরলা বসুর কুমারী নলিনী রায়-এর ভাই-এর সঙ্গে বিবাহ হবে। ছেলেটি আগে এঁদের সঙ্গে এক ভাবাপন্ন ছিলেন না। এক সভাতে তাঁর ভাবী পত্নীর সাহায্যেই তিনি পরিবর্ত্তিত জীবন লাভ করেছেন। এই ক্ষুদ্র প্রণয়ের বিষয় আমি সব জানি না, কিন্তু আমার মনে হয়, এর মধ্যে একটা ছোট খাটো রহস্য লুকানো আছে। আর পুস্তকাকারে প্রকাশিত হ'লে তা পড়তে আমাদের খুব ভাল লাগ্‌ত।

আর কত নাম করব? এই প্রতিজ্ঞা কত জীবনে যে কত পরিবর্ত্তন এনেছে তা আমি সব বল্‌তে পারি না, জানিও না। এঁদের মধ্যে অধ্যাপক আনন্দমোহন সরকারের জীবন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু আমি বোধ হয় এত বড় চিঠি লিখে তোমায় বিরক্ত করছি। এখন—আসল কথা।

আমি কি এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়েছি? আজ উপাসনার পর অমরেন্দ্র বল্‌লেন :—

"দেশের অন্ততঃ শিক্ষিত সমাজ যদি এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন তবে তার ফল কি হয়? কিন্তু কেন করবেন না? ইহা কি শুধু কর্ত্তব্যের চেয়ে বেশী কিছু? এ না করে কি মহাপুরুষদের অনুসরণ করা যায়? মহাপুরুষদের সমসাময়িক শিষ্যেরা যেমন ভাবে তাঁদের অনুসরণ করতেন, আমাদের অনুসরণ প্রণালী কি তার চেয়ে নিম্নতর?

'ধর্ম্মবল, নৈতিক বল যখন জাগ্‌বে দেশ তখনই জাগ্‌বে। তার কাছে পাশব-বল ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। আমাদের বন্দুক কামানের দরকার হবে না। মহাপুরুষেরা যে জগতে অটল রাজত্ব স্থাপন করে গিয়েছেন তাকি পাশব বলে, না অস্ত্র বলে? যারা পাশব-বলে জগত অধিকার করতে চেয়েছিল, তাদের রাজত্ব আজ কোথায়? নৈতিক বল—শুধু নৈতিক বল! দেশের জন্য সময় সময় প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই আশা মনে জাগে যে, দেশে সেই বল জাগ্‌বে। বিশ্বাসের সঙ্গে প্রতীক্ষা করি। ঈশ্বর সেই দিন দেবেন।"

কিন্তু—আমি কি করছি? ঈশ্বরের জন্য, দেশের জন্য কতটুকু 'দুঃখ' সহ্য করেছি? আমি কি এখন এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করব? আমি কি ঢাকায় গিয়ে পরের সপ্তাহে মন্দিরের উপাসনার পর বল্‌ব—'এসো, আমরা মহাপুরুষদের অনুসরণ করি। এমন ভাবে করি যা'তে দুঃখের, আত্মত্যাগের আস্বাদ পাওয়া যায়। এসো, আমরা এই প্রতিজ্ঞা করি, 'মহাপুরুষেরা কি করতেন' এই প্রশ্ন না করে কোন কাজ করব না।' যদি আমি এ কথা বলি তাঁরা কি কেউ সাড়া দেবেন? এ তাঁদের কাছে বিস্ময়কর ঠেক্‌বে। কিন্তু কেন? সত্যি কি আমাদের জীবনে মহাপুরুষদের অনুসরণই করতে হবে না? সকল ধর্ম্মের, সমন্বয় এই ব্রাহ্মধর্ম্ম; সকল মহাত্মার মিলন এই ব্রাহ্মধর্ম্মে। এই মহাধর্ম্ম পেয়েও কি আমরা তাদের অনুসরণ করব না? ভক্তদের যদি শ্রদ্ধা না করি তবে ভক্তবৎসলের উপর ভক্তি আস্‌বে কি করে? মহাপুরুষদের অনুসরণকারী মানে কি? তাঁদের অনুসরণ 'বল্‌তে কি বোঝায়?'

ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত পরেশনাথ ভট্টাচার্য্যের হাত হইতে কলম কাগজের উপর পড়িয়া

গেল। তিনি উঠিয়া জানালার কাছে গেলেন এবং জানালা খুলিয়া দিলেন। এই চিন্তায় তাঁহার হৃদয় নিষ্পেষিত হইতেছিল। তাঁহার মনে হইল, ঘরের বদ্ধ বায়ুতে তাঁহার শ্বাসরুদ্ধ হইয়া যাইবে। তিনি আকাশের তারা দেখিতে এবং পৃথিবীর মুক্ত বায়ু সেবন করিতে চাহিলেন।

নিস্তব্ধ রাত্রি। কলিকাতার পথ জনশূন্য হইয়া আসিয়াছে। এই সময়ে একদল যুবক ও বালক গাহিয়া যাইতেছিলেন :—

'দেখ যাত্রী যায় জয়গান গায়,
রাজপথে গলাগলি।
এ আনন্দ স্বরে কে রয়েছে ঘরে
কোণে ক'রে দলাদলি ?
বিপুল এ ধরা চঞ্চল সময়,
মহাবেগবান মানব হৃদয়,
যারা ব'সে আছে তারা বড় নয়,
ছাড় ছাড় মিছে ছল ভাই,
আগে চল আগে চল্ ভাই।
পিছায়ে যে আছে তারে ডেকে নাও
নিয়ে যাও সাথে করে,
কেহ নাহি আসে একা চলে যাও
মহত্ত্বের পথ ধ'রে।
পিছু হ'তে ডাকে মায়ার কাঁদন,
ছিঁড়ে চলে যাও মোহেরবাঁধন
মিছে নয়নের জল ভাই,
আগে চল্ আগে চল্ ভাই !'

পরেশ বাবু জানালা হইতে ফিরিয়া বিছানার কাছে মাটীতে বসিলেন। 'মহাপুরুষেরা কি করতেন ?' এই প্রশ্ন তিনি আগে কখনও এমন ভাবে করেন নাই। তিনি অনেক্ষকণ এই ভাবে রহিলেন। রাত্রে তাঁহার ভাল ঘুম হইল না।

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই তিনি উঠিলেন এবং আবার জানালার কাছে যাইয়া দাঁড়াইলেন। ক্রমে পূর্ব্বদিক উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়া সমস্ত সহরকে আলোকিত করিয়া দিল। তিনি আবার এই প্রশ্ন করিলেন,—'মহাপুরুষেরা কি করতেন ? তাঁরা কি করতেন ? আমি কি তাঁদের পদাঙ্কঅনুসরণ করব ?'

সমস্ত হৃদয় মনের মধ্যে এই প্রশ্ন লইয়া পরেশনাথ ভট্টাচার্য্য ঢাকায় ফিরিলেন। এক মহা পরিবর্ত্তন হঠাৎ তাঁহার জীবনের উপর আসিয়া পড়িল।

শ্রীনির্ঝরিণী ঘোষ।

মিলনের উৎসব।*

আমাদের এই উৎসব মিলনের উৎসব।

এর মধ্যে দুটি মিলন আছে। যেমন বিবাহ-উৎসবের কেন্দ্রস্থলে আছে বরকন্যার মিলন এবং তাকে বেষ্টন করে আছে আহুত অনাহুত রবাহুতের মিলন—পরিচিত অপরিচিত আত্মীয় অনাত্মীয় সকলের মিলন—তেমনি আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে এই উৎসবের কেন্দ্র স্থলে আছে আমার সঙ্গে আমার অধীশ্বরের মিলন এবং সেই মূল মিলনটিকে অবলম্বন করে বিশ্বসাধারণের সঙ্গে আনন্দ-মিলন।

আজ প্রভাতে সর্ব্বপ্রথমে সেই মূল কথাটিকে নিয়ে এই উৎসবের রাজ্যে প্রবেশ করতে চাই—সব মিলনের মূলে যে মিলন, যেখানে কেউ কোথাও নেই, জগত সংসার নেই, কেবল আমি আছি আর তিনি আছেন, সেই খান দিয়ে যাত্রা আরম্ভ করব—তার পরে সেই একটি মাত্র বৃন্তের উপরে স্থির নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে হৃদয়-পদ্মের একশো দলকে একেবারে বিশ্বভুবনের একশো দিকে ফুটিয়ে তোলা যাবে—তখন একের থেকে অনেকের দিকে প্রসারিত হয়ে উৎসব সম্পূর্ণ হবে।

অতএব এই পবিত্র শান্ত সময়ে গভীরতম নিভৃততম একলার কথা দিয়ে প্রভাত আরম্ভ করা যাক্! কোন্খানে আমি আর তিনি মিল্চেন, সেইটে একবার চেয়ে দেখি।

রোজই ত দেখা যায়, সকাল থেকেই সংসারের কথা ভাব্তে সুরু করি। কেন না, সে যে আমার সংসার, আমার ইচ্ছাটুকুই এই সংসারের কেন্দ্র। আমি কি চাই কি না চাই, কি রাখব কি ছাড়ব, এই কথাকেই মাঝখানে নিয়ে আমার সংসার।

---

* গত ১১ই মাঘ প্রাতঃকালে আদি ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক বিবৃত।

যে বিশ্বভুবনে বাস করি, তার ভাবনা আমাকে ভাবতে হয় না। আমার ইচ্ছার দ্বারা সূর্য্য উঠ্‌চে না, বায়ু বইচে না, অণু পরমাণুতে মিলন হয়ে বিচ্ছেদ হয়ে সৃষ্টি রক্ষা হচ্ছে না। কিন্তু আমি আমার নিজের ইচ্ছাশক্তিকে মূলে রেখে যে সৃষ্টি গড়ে তুলছি, তার ভাবনা আমাকে সকলের চেয়ে 'বড়' ভাবনা করেই ভাব্‌তে হয়; কেন না সেটা যে আমারি ভাবনা।

তাই এত বড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বৃহৎ ব্যাপারের ঠিক মাঝখানে থেকেও আমার এই অতি ছোট কথা আমার কাছে ছোট বলে মনে হয় না। আমার প্রভাত কালের সামান্য আয়োজন চেষ্টা প্রভাতের সুমহৎ সূর্য্যোদয়ের কাছে লেশ মাত্র লজ্জিত হয় না, এমন কি তাকে অনায়াসে বিস্মৃত হয়ে চল্‌তে পারে।

তবেই ত দেখছি, দুইটি ইচ্ছা পরস্পর সংলগ্ন হয়ে কাজ করচে। একটি হচ্ছে বিশ্বজগতের ভিতরকার ইচ্ছা, আর একটি আমার এই অতি ক্ষুদ্র জগতের ভিতরকার ইচ্ছা। রাজা ত রাজত্ব করচেন, আবার তাঁর অধীনের তালুকদার সেই মহারাজ্যের মাঝখানেই নিজের রাজত্বটুকু জমিয়েছে। তার মধ্যেও রাজৈশ্বর্য্যের সমস্ত লক্ষণ আছে—কেন না ঐ ক্ষুদ্র সীমাটুকুর মধ্যে তার ইচ্ছা, তার কর্তৃত্ব আছে।

এই আমাদের আমি-জগতের মধ্যে ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে রাজা করে দিয়েছেন। যে লোক রাস্তার ধূলো ঝাঁট দিচ্চে, সেও তার আমি-অধিকারের মধ্যে স্বয়ং সকলের শ্রেষ্ঠ। যিনি ইচ্ছাময় তিনি "যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ" আমাদের প্রত্যেককে একটি করে ইচ্ছার তালুক দান করেছেন।

আমাদের এই চিরন্তন ইচ্ছার অধিকার নিয়ে আমরা এক একবার অহঙ্কারে মত্ত হয়ে উঠি। বলি যে, আমার নিজের ইচ্ছা ছাড়া কাউকেই মানিনে। এই বলে', সকলকে লঙ্ঘন করার দ্বারাই, আমার ইচ্ছা যে স্বাধীন এইটে স্পর্দ্ধার সঙ্গে অনুভব করিতে চাই।

কিন্তু ইচ্ছার মধ্যে আর একটি তত্ত্ব আছে। স্বাধীনতায় তার চরম সুখ নয়। শরীর যেমন শরীরকে চায়, মন যেমন মনকে চায়, বস্তু যেমন বস্তুকে আকর্ষণ করে—ইচ্ছা তেমনি ইচ্ছাকে না চেয়ে থাক্‌তে পারে না। অন্য ইচ্ছার সঙ্গে মিলিত হতে না পারিলে এই একলা ইচ্ছা আপনার সার্থকতা অনুভব করে না। সে মায়ের কাছে থেকে কেবল সেবা চায় না, সেবার সঙ্গে মায়ের ইচ্ছাকেও চায়—বন্ধুর কাছ থেকে কেবল উপকার চায় না, বলে বন্ধু ইচ্ছা করেই প্রেমের সঙ্গে আমার উপকার করুক্—এমন কি, উপকার নাও করুক, কিন্তু তার ইচ্ছা যেন আমার দিকেই আসে, আমি যেন তার অনিচ্ছার সামগ্রী না হই।

এমনি করে, ইচ্ছা যেখানে অন্য ইচ্ছাকে চায়, সেখানে সে আর স্বাধীন থাকে না, সেখানে নিজকে তার খর্ব্ব করতেই হয়। আমি যেম্‌নি ইচ্ছা তেমনি চল্‌ব, অথচ অন্যের ইচ্ছাকে বশ করে আনব, এ ত হয় না। গৃহিণীকে বাড়ির সকলেরই সেবিকা হতে হয়, তবেই তিনি বাড়ির সকলের ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছাকে সম্মিলিত করে গৃহকে মধুর করে তুল্‌তে পারেন।

এই যে ইচ্ছার অধীনতা, এতবড় অধীনতা ত আর নেই। আমরা দাসতম দাসের কাছে থেকেও জোর করে ইচ্ছা আদায় করিতে পারি না—অতএব সেই ইচ্ছা যখন আত্মসমর্পণ করে, তখন আর কিছুই বাকি থাকে না।

তাই বলছিলুম—ইচ্ছাতেই আমাদের স্বাধীনতার সব চেয়ে বিশুদ্ধ স্বরূপ, তেমনি এই ইচ্ছার মধ্যেই অধীনতারও সকলের চেয়ে বিশুদ্ধ মূর্ত্তি। ইচ্ছা, অহঙ্কারের মধ্যে আপনাকে স্বাধীন বলে প্রকাশ করে' সুখ পায় বটে, কিন্তু তার চেয়ে বড় সুখ পায় প্রেমে আপনাকে অধীন বলে স্বীকার করে'।

ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যেও এই ধর্ম্মটি দেখ্‌তে পাচ্চি—তিনিও ইচ্ছাকে চান। এই জন্যেই—চাইতে পারিবেন বলেই--আমার ইচ্ছাকে তিনি আমার করে দিয়েছেন। বিশ্বনিয়মের জালে তাকে একেবারে নিঃশেষে বেঁধে ফেলেননি। বিশ্বসাম্রাজ্যে আর সমস্তই তাঁর ঐশ্বর্য্য, কেবল ঐ একটি জিনিষ তিনি নিজে রাখেননি—সেটা আমার ইচ্ছা ঐটে তিনি কেড়ে নেন না, চেয়ে নেন--মন ভুলিয়ে নেন। ঐ একটি জিনিষ আছে যেটি আমি

তাঁকে সত্যই দিতে পারি। ফুল যদি দিই সে তাঁরই ফুল, জল যদি দিই সে তাঁরই জল - কেবল ইচ্ছা যদি সমর্পণ করি, সে আমারি ইচ্ছা বটে।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর এইখানে তাঁর ঐশ্বর্য্য খর্ব্ব করেছেন। আমার কাছে এসে বল্‌চেন, আমি রাজখাজনা চাইনে, আমাকে প্রেম দাও। হে প্রেম-স্বরূপ! তোমাকে প্রেম দিতে হবে বলেই তুমি এত কাণ্ড করেছ। আমার মধ্যে এই এক সৃষ্টিছাড়া "আমি"র লীলা ফেঁদে বসেছ, এবং আমাকে এই একটি ইচ্ছার সম্পদ দিয়ে সেটি পাবার জন্যে আমার কাছেও হাত পেতে দাঁড়িয়েছ।

তাই যদি না হ'ত, তবে এ গানটি গাইতে কি আমার সাহস হ'ত?

"নাথ হে, প্রেমপথে সব বাধা ভাঙিয়া দাও—
মাঝে কিছুই রেখোনা রেখোনা—
থেকোনা থেকোনা দূরে!"

এ কেমন প্রার্থনা? এ প্রেম কার সঙ্গে? মানুষ কেমন করে এ কথা কল্পনাতেও এনেছে এবং মুখেও উচ্চারণ করেছে যে বিশ্বভুবনেশ্বরের সঙ্গে তার প্রেম হবে? বিশ্বভুবন বল্‌তে কতখানি বোঝায় এবং তার তুলনায় মানুষ যে এত ছোট যে কোন অঙ্কের দ্বারা তার পরিমাণ করা দুঃসাধ্য।

এমন যে অচিন্তনীয় ব্রহ্মাণ্ডের পরমেশ্বর—তাঁরই সঙ্গে এই কণার কণা, অণুর অণু, বলে কি না প্রেম করবে! অর্থাৎ, তাঁহার রাজ-সিংহাসনে একেবারে তাঁর পাশে এসে বসবে? অনন্ত আকাশে নক্ষত্রে নক্ষত্রে তাঁর জগৎ-যজ্ঞের হোম-হুতাশন যুগযুগান্তর জ্বল্‌চে, আমি সেই যজ্ঞ-নক্ষত্রের অসীম জনতার এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে কোন্ দাবীর জোরে দ্বারীকে বল্‌চি, এই যজ্ঞেশ্বরের এক শয্যায় আমাকে আসন দিতে হবে?

মানুষ জগদীশ্বরের সঙ্গে প্রেম করতে চায়, এ কি তার অত্যাকাঙ্ক্ষার অশান্ত উন্মত্ততা, অহঙ্কারের চরম পরিচয়?

কিন্তু অহঙ্কারের একটা যে লক্ষণ নিজেকেই ঘোষণা করা, সেটা ত এর মধ্যে দেখ্‌চিনে—এ যে নিজেকে একেবারে বিলুপ্ত করা। তাঁর প্রেমের জন্যে যে লোক ক্ষেপেছে, সে যে নিজকে দীন করে' সকলের পিছনে এসে দাঁড়ায়, যাঁরা ঈশ্বরের প্রেমের দরবারের দরবারী তাঁদের পায়ের ধূলা পেলেও সে যে বাঁচে।

সেই জন্যে, জগৎ সৃষ্টির মধ্যে এইটেই সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য বলে বোধ হয় যে, মানুষ তাঁর প্রেম চায়—এবং সকল প্রেমের চেয়ে সেইটেকেই বড় সত্য—বড় লাভ—বলে চায়।

কেন চায়? কেন না, সে যে অধিকার পেয়েছে। হোন না তিনি বিশ্বজগতের রাজাধিরাজ, এই প্রেমের দাবী তিনিই জন্মিয়ে দিয়েছেন, আবার প্রেমও তাঁরই সঙ্গে। এতে আর ভয় লজ্জা কিসের!

তিনি যে আমাকে একটি বিশেষ "আমি" করে তুলে সমস্ত জগৎ থেকে স্বতন্ত্র করে দিয়েছেন। এক দিকে বিরাট ব্রহ্মাণ্ড, আর এক দিকে আমার এই আমি! এ রহস্য কেন? এই ছোট আমিটির সঙ্গে সেই পরম আমি যে মিলবেন!

এমন যদি না হ'ত তবে তাঁর জগৎ-রাজ্যের একলা রাজা হয়ে তাঁর কিসের আনন্দ? কোথাও যাঁর কোনো সমাজ নেই তিনি কি ভয়ঙ্কর একলা, কি অনন্ত একলা! তিনি ইচ্ছা করে কেবল প্রেমের জোরে এই তাঁর একাধিপত্য এক জায়গায় বিসর্জ্জন করেছেন! তিনি আমার এই "আমি" টুকুর আনন্দ-নিকেতনে বিশেষ করে নেমে এসেছেন। বলে দিয়েছেন, "আমার চন্দ্র-সূর্য্যের সঙ্গে তোমার নিজের দামের হিসাব করতে হবে না। কেন না ওজনদরে তোমার দাম নয়। তোমার দাম আমার আনন্দের মধ্যে—তোমার সঙ্গেই আমার বিশেষ প্রেম বলে'ই তুমি হয়েছ, তুমি আছ।"

এই খানেই আমার এত গৌরব যে, তাঁকে সুদ্ধ আমি অস্বীকার করতে পারি। বলতে পারি—"আমি তোমাকে চাই নে!" সে কথা তাঁর ধুলোজলকে বলতে গেলেও তারা সহ্য করে না—তারা তখনি মারতে আসে! কিন্তু তাঁকে যখনি বলি, "তোমাকে আমি চাইনে, আমি টাকা চাই, খ্যাতি চাই," তিনি বলেন, 'আচ্ছা বেশ!' বলে চুপ করে বসে থাকেন!

এদিকে কখন এক সময় হুঁস্ হয় যে, আমার আত্মার যে নিভৃত নিকেতন, সেখানকার চাবি ত আমার খাতাঞ্চির হাতে নেই—টাকাকড়ি ধনদৌলৎ কোনমতেই সেখানে গিয়ে পৌঁছায় না—বাইরে আবর্জ্জনার মত পড়ে থাকে। সেখানে ফাঁক থেকেই যায়! সেখানকার সেই একলা ঘরটিকে জগতের আর একটি মহান্ একলা ছাড়া কেউ কোনোমতেই ভরাতে পারে না। যে দিন বলতে পারব, আমার টাকায় কাজ নেই, খ্যাতিতে কাজ নেই, কিছুতে কাজ নেই, তুমি এস; যে দিন বলতে পারব, চন্দ্রসূর্য্যহীন একলা ঘরটিতে তুমি আমার আর আমি তোমার, সেই দিন আমার "আমি" জন্মের মত সার্থক হবে!

আমাদের অন্তরাত্মার "আমি"-ক্ষেত্রের একটা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডছাড়া নিকেতনে সেই আনন্দময়ের যে যাতায়াত আছে, জগৎজুড়ে তার নিদর্শন পড়ে রয়েছে! আকাশের নীলিমায়, বনের শ্যামলতায়, ফুলের গন্ধে, সর্ব্বত্রই তাঁর সেই পায়ের চিহ্ন ধরা পড়েছে যে! সেখানে যদি তিনি রাজবেশ ধরে আসতেন, তা'হলে জোড়হাত করে মাথা ধুলোয় লুটিয়ে তাঁকে মানতুম—কিন্তু ঐ জায়গায় তিনি যে বন্ধুর বেশে ধীরপদে আসেন, একেবারে একলা আসেন, সঙ্গে তাঁর পদাতিকগুলো শাসনদণ্ড হাতে জয়ডঙ্কা বাজিয়ে আসে না, সেই জন্যে পাপ ঘুম ভাঙতেই চায় না, দরজা বন্ধই থাকে!

কিন্তু এমন করলে ত চল্‌বে না! শাসনের দায় নেই বলেই লক্ষ্মীছাড়া যদি প্রেমের দায় স্বীকার না করে তবে জন্মজন্ম সে কেবল দাস দাসানুদাস হয়েই ঘুরে মরবে! মানবজন্ম যে আনন্দের জন্য সে খবরটা সে একেবারেই পাবে না! ওরে, অন্তরের যে নিভৃততম আবাসে চন্দ্রসূর্য্যের দৃষ্টি পৌঁছায় না, যেখানে অন্তরঙ্গ মানুষেরও প্রবেশ-পথ নেই, যেখানে কেবল একলা তাঁরই আসন পাতা, সেইখানকার দরজাটা খুলে দে', আলো জেলে তোল্! যেমন প্রভাতে সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্চি, তাঁর আলোক আমাকে সর্ব্বাঙ্গে পরিবেষ্টন করে আছে, যেন ঠিক তেমনি প্রত্যক্ষ বুঝতে পারি, তাঁর আনন্দ, তাঁর ইচ্ছা, তাঁর প্রেম, আমার জীবনকে সর্ব্বত্র নীরন্ধ্র নিবিড়ভাবে পরিবৃত করে আছে! তিনিও পণ করে বসে আছেন, তাঁর এই আনন্দমূর্ত্তি তিনি আমাদের জোর করে দেখাবেন না—বরঞ্চ তাঁর এই জগৎজোড়া সৌন্দর্য্যের আয়োজন প্রতিদিন আমার কাছে ব্যর্থ হবে, তবু তিনি এতটুকু জোর করবেননা। যে দিন আমার প্রেম জাগবে, সে দিন তাঁর প্রেম আর লেশমাত্র গোপন থাকবে না। কেন যে "আমি" হয়ে এত দিন এত দুঃখে দ্বারে দ্বারে ঘুরে মরচি, সেদিন সেই বিরহ-দুঃখের রহস্য এক মুহূর্ত্তে ফাঁস হয়ে যাবে।

হে আমার প্রাণের প্রাণ, জগতের সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে সাধারণভাবে আমার মিল আছে। ধূলির সঙ্গে পাথরের সঙ্গে আমার মিল আছে, সাধারণ মনুষ্যের সঙ্গে আমার মিল আছে। কিন্তু এক জায়গায় একেবারে মিল নেই—যেখানে আমি হচ্চি বিশেষ। আমি যাকে "আমি" বল্‌চি এর আর কোনো দ্বিতীয় নেই। ঈশ্বরের অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে এ সৃষ্টি অপূর্ব্ব—এ কেবলমাত্র "আমি", একলা "আমি", অনুপম অতুলনীয় "আমি"। এই "আমি"র যে জগৎ সে একলা আমারই জগৎ—সেই মহাবিজন লোকে, হে আমার অন্তর্য্যামি, তুমি ছাড়া কারো প্রবেশ করবার কোনো জো নেই।

প্রভু, সেই যে একলা আমি, বিশেষ আমি, তার মধ্যে তোমার বিশেষ আনন্দ, বিশেষ আবির্ভাব। সেই বিশেষ আবির্ভাবটি আর কোনো দেশে কোনো কালেই নেই। আমার সেই বিশিষ্টতাকে আমি সার্থক করব প্রভু! এই আমি নামক তোমার সকল হতে স্বতন্ত্র এই যে একটী বিশেষ লীলা আছে, এই বিশেষ লীলায় তোমার সঙ্গে যোগ দেব—একের সঙ্গে এক হয়ে মিলব!

এই আমিটিকে অনাদিকাল থেকে তুমি বহন করে আন্‌চ। কত সূর্য্য-চন্দ্র গ্রহ-তারার মধ্যে দিয়ে এ'কে তোমার পাশে করে হাতে ধরে নিয়ে এসেচ, কিন্তু কারো সঙ্গে এ'কে জড়িয়ে ফেলনি! কোন্ নীহারিকার জ্যোতির্ম্ময় বাষ্পনির্ঝর থেকে এর অণু পরমাণুকে চালনা করে কত পুষ্টি, কত পরিবর্ত্তন, কত পরিণতির ভিতর দিয়ে এই আমিকে আজ এই শরীরে ফুটিয়ে তুলেছ!

তোমার সেই অনাদিকালের সঙ্গ যে আমার এই দেহটির মধ্যে সঞ্চিত হয়ে আছে। অনাদিকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত অনন্ত সৃষ্টির মাঝখান দিয়ে একটি বিশেষ রেখাপাত হয়ে এসেছে, সেটি হচ্চে এই "আমি"র রেখা। সেই তুমি আমার অনাদি পথের চালক, অনন্ত পথের অদ্বিতীয় বন্ধু। তোমাকে আমার সেই একলা বন্ধুরূপে আমার জীবনের মধ্যে উপলব্ধি করব। আর কোনো কিছুই তোমার সমান না হোক, তোমার চেয়ে বড় না হোক্! আর আমার এই যে একটা সাধারণ জীবন, যা নানা ক্ষুধা তৃষ্ণা চিন্তা চেষ্টা দ্বারা আমি সমস্ত তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে একত্রে মিলে ভোগ করচি, সেইটেই নানাদিক দিয়ে প্রবল হয়ে না উঠে। আমি যেখানে জগতের সামিল, সেখানে তোমাকে জগদীশ্বর বলে মানি—কিন্তু 'আমি' রূপে তোমাকে আমার একমাত্র বলে জান্‌তে চাই। এই আমি-ক্ষেত্রেই আমার সব দুঃখের চেয়ে পরম দুঃখ—তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদ অর্থাৎ অহঙ্কারের দুঃখ—আমার সব সুখের চেয়ে পরম সুখ তোমার সঙ্গে মিলন অর্থাৎ প্রেমের সুখ এই অহঙ্কারের দুঃখ কেমন করে ঘুচ্‌বে, সেই ভেবেই বুদ্ধ তপস্যা করেছিলেন এবং এই অহঙ্কারের দুঃখ কেমন করে ঘোচে, সেই জানিয়েই খ্রীষ্ট প্রাণ দিয়েছিলেন। হে পুত্র হতে প্রিয়, বিত্ত হতে প্রিয়, হে অন্তরতম প্রিয়তম, এই "আমি"-নিকেতনেই যে তোমার চরম লীলা, এই জন্যেই ত এইখানেই এত নিদারুণ দুঃখ, এবং সে দুঃখের এমন অপরিসীম অবসান! সেই জন্যেই ত এই খানেই মৃত্যু এবং অমৃত, সেই মৃত্যুর বক্ষ বিদীর্ণ করে উৎসারিত হচ্চে। এই দুঃখ এবং সুখ, মিলন এবং বিচ্ছেদ, মৃত্যু এবং অমৃত, তোমার দক্ষিণ ও বাম দুই বাহু, এর মধ্যে সম্পূর্ণ ধরা দিয়ে যেন বল্‌তে পারি—আমার সব মিটেছে, আমি আর কিছু চাইনে।

ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ।

চিত্র-বিচার।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী মহাশয় সম্প্রতি "লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন" নামক এক খানি চিত্র অঙ্কিত করিয়া, তাহা মুদ্রিত করতঃ বিক্রয়ার্থ বাজারে বাহির করিয়াছেন। বাঙ্গালার ইতিহাসে লক্ষ্মণসেনের পলায়ন সুপরিচিত ঘটনা। কিন্তু ঘটনাটী সত্য কি না সে বিষয়ে অনেকেরই সন্দেহ আছে। এ সম্বন্ধে প্রচলিত বিবরণ এই :—

বঙ্গেশ্বর রাজা লক্ষ্মণসেনের জন্মের পূর্ব্বে তাঁহার জননীর গর্ভবেদনা উপস্থিত হইলে গণৎকারগণ বলিলেন, "এ অতি অশুভ সময়, এই সময়ে রাজকুমার জন্মগ্রহণ করিলে অতি অমঙ্গল ঘটিবে, কিন্তু আর দুই ঘণ্টা পরে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি আশী বৎসর কাল রাজত্ব করিতে পারিবেন।" ভাবী সন্তানের অমঙ্গলাশঙ্কায় জননী ভীত হইলেন। তিনি আদেশ করিলেন, তাঁহার পদদ্বয় উর্দ্ধদিকে বাঁধিয়া তাঁহাকে দুই ঘণ্টা কাল ঝুলাইয়া রাখা হউক; তাহাই হইল। প্রসব কালীন এই কষ্টে প্রসূতি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। কিন্তু লক্ষ্মণসেন সত্য সত্যই আশী বৎসর রাজত্ব করিলেন বক্তিয়ার খিলজি যখন নবদ্বীপ আক্রমণ করেন, তখন তাঁহার ১৭জন অশ্বারোহী সৈন্যের আগমন-সংবাদ মাত্র পাইয়া লক্ষ্মণসেন খিড়কী দ্বার দিয়া নৌকাযোগে পলায়ন করিলেন। উড্ডীয়মান পাল-বিশিষ্ট ময়ূরপঙ্খী নৌকা ঘাটে বাঁধা, বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেন লাঠি ভর করিয়া নৌকায় উঠিতে যাইতেছেন, ইহাই আলোচ্য চিত্রের বিষয়।

লক্ষ্মণসেনের পলায়ন বৃত্তান্ত যে কল্পনাপ্রসূত বঙ্কিমচন্দ্র তাহা ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। সিরাজদ্দৌলা-প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় গত জানুয়ারী মাসের "মডার্ণ রিভিউ" নামক পত্রে এই চিত্র উপলক্ষে তাঁহার মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি, বলেন এই কাহিনী সম্পূর্ণ কল্পনা-প্রসূত। আমরা সংক্ষেপে তাঁহার প্রবন্ধের মর্ম্ম অনুবাদ করিয়া দিলাম।

"বক্তিয়ার খিলজির আগমনের ৬০ বৎসর পরে মিনহাজ-ই-সিরাজ বক্তিয়ারের বৃদ্ধ সেনাদিগের মুখে

শুনিয়া তাঁহার "তাবকুয়াৎ-ই-নাসেরী" গ্রন্থে এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন। তাহা হইতে বিদ্যালয় পাঠ্য ইতিহাসে এই কাহিনী প্রচলিত হইয়াছে।

কিন্তু সত্য সত্যই কি বঙ্গের শেষ হিন্দু রাজা তাঁহার রাজধানীর পথে ১৭জন মুসলমান অশ্বারোহী দেখিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন? যদি তাই হয় তবে এই হতভাগ্য অপদার্থকে, যে তাহার নিজের এবং স্বজাতির স্মৃতিকে অনন্ত কালের জন্য হীনতায় জড়িত করিয়া রাখিয়াছে?

গ্রীক ও চাইনিজগণ এদেশে বাস করিয়া বাঙ্গালী-চরিত্রে কাপুরুষতা দেখিতে পায় নাই। কাশ্মীরের ইতিহাস-বেত্তা কহ্লন, ভারতে মুসলমান প্রবেশের সমকালেও গৌড়ীয় বীরত্বের নিদর্শনস্বরূপ বাঙ্গালী সৈন্য কর্ত্তৃক কাশ্মীরের অন্তর্গত ত্রিগ্রামী নগর অবরোধের কথা সুললিত সংস্কৃতে বর্ণন করিয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত নবাবিষ্কৃত প্রাচীন শিলালিপি সমূহ হইতে জানিতে পারা যায়:—(১) বঙ্গের পালরাজগণ মগধ পর্য্যন্ত তাঁহাদের রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। (২) তাঁহারা আধুনিক মুঙ্গের পর্য্যন্ত শাসন করিতেন। (৩) তাঁহারা পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গ পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন। (৪) কর্ণাট-ক্ষত্রিয় বংশীয় সেনরাজগণ দক্ষিণ হইতে বঙ্গে আসিয়াছিলেন এবং (৫) বিজয়ী বিজয়সেন বরেন্দ্রভূমিতে (রাজসাহীতে) প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বল্লালসেন গৌড় অধিকার করিয়াছিলেন এবং তৎকালের এক জন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ছিলেন। বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন পিতার রাজধানীর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া তাহার লক্ষ্মণাবতী নাম দিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বে কামরূপ হইতে পশ্চিমে কাশী পর্য্যন্ত যুদ্ধযাত্রা করিয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন। (৬) মিনহাজ-ই-সিরাজ বখ্তিয়ারের আবির্ভাবের ৬০ বৎসর পরে বঙ্গে আসিয়া বঙ্গদেশকে (পূর্ব্ববঙ্গ) লক্ষ্মণের পুত্র বিশ্বরূপের শাসনাধীন দেখিয়া যান। বিশ্বরূপ-খোদিত তাম্রশাসনে লিখিত আছে "স গর্গযবনান্বয় প্রলয়কালরুদ্রো নৃপঃ"—অর্থাৎ তিনি গর্গ (ঘোরীয়) বংশোদ্ভূত যবনগণের প্রলয়কালীন রুদ্রের ন্যায় (বিনাশকারী) ছিলেন। (৭) বঙ্গদেশ তৎকালে (ক) রাঢ় (খ) বরেন্দ্র (গ) মিথিলা (ঘ) বঙ্গ (পূর্ব্ববঙ্গ) ঙ) বাগ্‌ড়ী এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল এবং তাহার তিনটী রাজধানী ছিল:—(১) পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমপুর (২) উত্তর বঙ্গে লক্ষ্মণাবতী (৩) রাঢ়ে লকনর। (৮) অনুমান ১২০৫ খৃষ্টাব্দে দিনাজপুরের অন্তর্গত দেবকোটে বখ্তিয়ার খিলিজির মৃত্যু হয়। তিনি লক্ষ্মণাবতী প্রদেশের কয়েকটী মাত্র পরগণা অধিকার করেন ও তাঁহার সেনানীদিগকে জায়গীর দিয়া এই সকল পরগণায় প্রতিষ্ঠিত করেন। লক্ষ্মণাবতী (গৌড়) ও দেবকোটের পার্শ্ববর্ত্তী কোন কোন স্থানে মাত্র এই জায়গীরের নিদর্শন পাওয়া যায়। (৯) মুশলমানগণের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ সত্ত্বেও উত্তর বঙ্গের রাজাগণ দীর্ঘকাল অর্দ্ধ স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন।

এই সকল মূল্যবান তত্ত্ব বর্ত্তমান থাকিতে তাহার বিরুদ্ধে বখ্তিয়ার খিলজির বৃদ্ধ সেনাগণের মৌখিক গল্প—(একমাত্র যাহার উপর মিনহাজের কাহিনী প্রতিষ্ঠিত) কতটা বিশ্বাসযোগ্য তাহা প্রনিধানের বিষয়।

এই গল্পটীর মূল রায় লছমনিয়া নামক জনৈক রাজার পলায়নের সহিত সংসৃষ্ট। তিনি নওদিয়া (নবদ্বীপ বা নদীয়া নহে) নামক তাঁহার রাজধানী হইতে মিথিলা দেশ-প্রচলিত লক্ষ্মণাব্দের অনুমান ৮০ সনে পলায়ন করেন।

এই রায় লছমনিয়া কে, তাঁহার রাজধানী নওদিয়া কোথায়, তাহার বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। সাধারণতঃ রাজ্যারম্ভের সময় হইতে রাজার নামে সম্বৎ গণনা আরম্ভ হয়, কিন্তু এ স্থলে তাহার ব্যতিক্রম করিয়া লক্ষ্মণসেনের জন্ম হইতে বর্ষ গণনা করিয়া লক্ষ্মণ সম্বতের হিসাব করিতে হয়।*

ইহা বলা অনাবশ্যক যে কতকগুলি কল্পনা জল্পনা না করিলে যে কাহিনী বিশ্বাস করিবার মত প্রমাণ পাওয়া যায় না, তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ থাকিতে সেই কাহিনী বিশ্বাস করা উচিত নহে।

* কিন্তু কথিত আছে, লক্ষ্মণসেনের জন্মের পূর্ব্বে হইতেই গর্ভস্থ সন্তানের নামে রাজ্য শাসিত হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত আর, ডি, বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনৈক বাঙ্গালী ভদ্রলোক বুদ্ধগয়ার শিলালিপি হইতে দেখাইয়াছেন যে, লক্ষ্মণ সেন তন্নামে প্রচলিত সম্বতের ৫১ বৎসরের অধিক জীবিত থাকার কথা সত্যবিরুদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়।”

শ্রীযুক্ত মৈত্র মহাশয় লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনীর বিরুদ্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা ঐতিহাসিক সমাজে গৃহীত হইবে কি না, আমরা জানি না। কিন্তু ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে যখন সন্দেহ আছে এবং সেই সন্দেহ অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, তখন আমাদের স্বদেশী চিত্রকর এই অপ্রমাণিত জাতীয় কলঙ্কের পরিচয় জগৎ সমক্ষে ঘোষণা করিবার জন্য এই চিত্র অঙ্কিত করিয়া ভাল করেন নাই। চিত্রের শত শত উপকরণ বিদ্যমান থাকিতে—যাহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে—এমন বিষয়ে চিত্রাঙ্কণের আবশ্যকতা কি? আর সত্য হইলেও এরূপ চিত্র দ্বারা কোন উপকারের প্রত্যাশা করা যায় না।

সৌভাগ্য ক্রমে চিত্রশিল্পের উন্নতির প্রতি ভারতবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। আমরা আশা করি, চর্চ্চা দ্বারা ক্রমেই এই শিল্পের উন্নতি হইবে। কিন্তু চিত্রকরগণ আর একটু সাবধান হইলে ভাল হয়। এই সংখ্যায় শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সম্পাদিত “সরল কাশীরাম দাস” হইতে “শমীবৃক্ষতলে অর্জ্জুনের রণসজ্জা” নামক আর এক খানি চিত্র আমরা প্রকাশ করিলাম। যোগীন্দ্র বাবুর রামায়ণ ও মহাভারতে কয়েকখানি অতি সুন্দর সুন্দর চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু ২।১ খানা চিত্রে চিত্রকরের নিতান্ত অজ্ঞতা প্রকাশ পাইয়াছে। উপরোল্লিখিত চিত্রখানি কিরূপ হাস্যকর হইয়াছে পাঠক পাঠিকাগণ দৃষ্টিপাত মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। চিত্রকর যেন নিতান্ত বিদ্রূপ করিবার জন্যই চিত্রখানি অঙ্কিত করিয়াছেন। দেবসেনাপতি কার্ত্তিক যেমন বাঙ্গালী কুম্ভকারের হাতে পড়িয়া “ফুল বাবু” সাজিয়াছেন, অর্জ্জুনকে বর্ত্তমান চিত্রকর তেমনি নূতন বাঙ্গালী “জামাই বাবু” সাজাইয়াছেন। আমরা আশা করি বাঙ্গালার বাজারে ইতিহাস বিরুদ্ধ ও স্বভাব বিরুদ্ধ চিত্র আমরা আর দেখিতে পাইব না।

কাছে।

কাছে যবে থাকি আমি, পারিনা বুঝিতে
তোমার মহিমা, তব প্রেম সাগরের
তলহীন গভীরতা। বাসনা খুঁজিতে
নাহি হয়, কোথা আছে তব হৃদয়ের
কোন্ খানে লুক্কায়িত আমার লাগিয়া
পরিপূর্ণ সুধাভাণ্ড। যেন মদিরায়
অবশ চেতনাহীন স্বপনে জাগিয়া
সারা রাত্রিদিন সখি, মোর কেটে যায়।
কে তুমি, কি ভাবে বিশ্বে চালাইছ মোরে
কেমনে সেবিছ মোরে দেবতার প্রায়,
কি স্বর্গ সৃজেছ তুমি মোর ক্ষুদ্র ঘরে,
কিছু না বুঝিতে পারি, বোঝা নাহি যায়।
মুগ্ধ শুধু চেয়ে চেয়ে তোমার নয়ানে,
জ্ঞান হারা থাকি আমি বিভোর পরাণে।

শ্রীপ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নারী-সংবাদ।

শ্রীমতী দ্বারকাবাই কমলাকর নাম্নী জনৈক বিবাহিতা মহিলা কিছু দিন পূর্ব্বে মান্দ্রাজ মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অধ্যয়ন সমাপ্ত করিবার জন্য ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া তিনি সম্প্রতি দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাকে অভিনন্দন করিবার জন্য সেদিন মান্দ্রাজের “হিন্দু সমাজ-সংস্কার সমিতি” (The Madras Hindu Social Reform Association) এক সমাজিক সম্মিলন আহ্বান করিয়াছিলেন। গীত বাদ্য, তামাসা ও যথাবিধি জলযোগের পর বিচারপতি শঙ্কর নায়র মহাশয় শ্রীমতী দ্বারকাবাইএর কৃতকার্য্যতার জন্য আনন্দ প্রকাশ করিয়া সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাকে এক অস্ত্রচিকিৎসার যন্ত্রের বাক্স উপহার প্রদান করেন। শ্রীমতী দ্বারকাবাই অতি বিনয় সহকারে সমবেত সকলকে ধন্যবাদ করিয়া নিম্নলিখিত বক্তৃতা করেন :—

সভাপতি মহাশয়, হিন্দুসমাজসংস্কারক সমিতির সভ্য মহোদয়গণ, সমবেত অন্যান্য মহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ! হৃদয়োত্থিত আনন্দ-প্রকাশের ভাষা সংক্ষিপ্ত. আজ যে আনন্দ উপভোগ করিলাম তাহা প্রকাশের ভাষা আমার নাই। আপনারা আমাকে যে সম্মান করিলেন তাহা আমার অন্তরকে কিরূপ গভীর ভাবে স্পর্শ করিয়াছে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। আমি আপনাদের সকলকে এ জন্য ধন্যবাদ করি। আপনাদের এই সম্মান প্রদর্শনকে আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা করি। কিন্তু এই সম্মান আমার প্রাপ্য নহে, স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের যে চেষ্টা—এই সম্মান তাহারই প্রাপ্য।

এই প্রচীন দেশে জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সরস্বতী এবং ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা লক্ষ্মী—উভয়েই স্ত্রীলোক কিন্তু কি আশ্চর্যের বিষয় যে, পুরুষগণ জ্ঞানকে কেবল নিজেদেরই আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছেন; সৌভাগ্যের বিষয় ধন সম্বন্ধেও তাহা হয় নাই। কিন্তু দুর্ব্বলা নারীজাতি আর হতাশ হইয়া বসিয়া নাই। এ দেশের নবজ্ঞানোন্নতি পারিবারিক জীবনেও পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে। ইউরোপীয় জ্ঞান অন্তঃপুরের দ্বারে আঘাত করিতেছে এবং অন্তঃপুরেও কোলাহল উপস্থিত হইয়াছে।

কোন দেশের নারীজাতির অধোগতির অর্থ, সে দেশের অর্দ্ধ মস্তিষ্ক-শক্তির অপব্যয়। সমাজসংস্কারকগণকে ধন্যবাদ, স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারপ্রয়াসী মহোদয়গণকে ধন্যবাদ। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে শ্রীমতী আলি আকবর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে শ্রীমতী সথিয়ানাধন, হাইদ্রাবাদে সুকবি শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এবং মহীশূরে সৌভাগ্যবতী শ্রীমতী রুক্মিনী আম্মলের ন্যায় মহিলাগণ বর্ত্তমান থাকিতে আমি কি একথা বলিতে পারি না যে, ভারতনারী উচ্চ জ্ঞানচর্চ্চা এবং বুদ্ধিতে পশ্চাদপদ নহে, এবং শিক্ষা বিষয়ে তাহারা উৎসাহ লাভের যোগ্য?

আপনারা এতগুলি সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় নরনারী আমাকে সমাদর করিবার জন্য আজ এখানে উপস্থিত, তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে পুনরায় ধন্যবাদ করি। আপনারা আমাকে যে উপহার দিয়াছেন আমার নিকট তাহা অমূল্য। আমি যখন এই সকল অস্ত্র ব্যবহার করিব তখন আপনাদের শুভ ইচ্ছা আমাকে কার্য্যে অনুপ্রাণনা আনিয়া দিবে। আমার সৌভাগ্য যে, আমি এখন একটী সম্মানিত ব্যবসায় অবলম্বন করিতে যাইতেছি। খ্রীষ্টান শাস্ত্রানুসারে এই চিকিৎসা ব্যবসায়ের সৃষ্টি আদমের অস্থিপঞ্জর হইতে যখন হবার উৎপত্তি; হিন্দু শাস্ত্রানুসারে—দেবগণ সমুদ্র মন্থন করিয়া যে চতুর্দ্দশ "রত্ন" লাভ করেন তন্মধ্যে জীবন ও স্বাস্থ্যপ্রদ "অমৃত" হস্তে ধারণ করিয়া যখন দেববৈদ্য "ধন্বন্তরীর" আবির্ভাব।

ভারতবাসীর সামাজিক জীবনে নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য পুরুষগণের সামাজিক সম্মিলনীর অনুষ্ঠান কতকটা নুতন ব্যাপার। কিন্তু পুরাতনের পরিবর্ত্তন হইতেছে, নুতন তাহার স্থান অধিকার করিতেছে।

শ্রীমতী এনি বেশান্তের প্রতিষ্ঠিত কাশী সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজের পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে কাশীর মহারাজা বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীমতী বেশান্ত ভারতবাসীর রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ সম্বন্ধে বলেন, "স্বাধীনতা দেবী অতি পবিত্র। যে দেশের লোকের মধ্যে আত্মসংযম, নীতিপরায়ণতা, শৃঙ্খলা ও হৃদয়ের পবিত্রতা থাকে না তিনি সে দেশে অবতরণ করেন না। উত্তেজক বক্তৃতা, অথবা পথে পথে জাতীয় সংগীত গান করিলেই স্বাধীনতা লাভ করা যায় না। দায়িত্ববোধ, জনসাধারণের প্রতি কর্ত্তব্যজ্ঞান, স্বাধীন জাতি সমূহের ইতিহাস পাঠ, আত্মত্যাগ—এই সকল উপায়ে স্বাধীনতা লাভ করিতে হয়। এই উদ্দেশ্যেই হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।"

নিজাম রাজ্যের অধীন হায়দ্রাবাদ সহর জলপ্লাবনে কিরূপ উৎসন্নপ্রায় হইয়াছিল, সকলেই সংবাদপত্রে পড়িয়া থাকিবেন। সহস্র সহস্র ঘরবাড়ী বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল, শত শত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। এই জলপ্লাবনক্লিষ্ট লোকদিগকে সাহায্য করিবার জন্য

জনসাধারণ ও সরকারী সৈন্যগণ অনেক শ্রম করিয়াছিল। নারীগণও এবিষয়ে উদাসীন ছিলেন না। সম্প্রতি সাহায্য-সমিতির নারীবিভাগের কার্য্যের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিলে দেখা যায়, শ্রীমতী হায়দরী ও শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এই উপলক্ষে কঠোর পরিশ্রম করিয়াছিলেন। প্রাতঃকাল ৮½ টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত তাঁহারা অকাতরে শ্রম করিয়াছেন। শুধু আহারের জন্য একটুকু সময় কার্য্যে বিরত হইতেন। উপরোক্ত মহিলাদ্বয় ব্যতীত আরো অনেক ভদ্রমহিলা এই পবিত্র পরসেবা কার্য্যে বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন। এই ঘটনা উপলক্ষে দেখা গিয়াছে যে, যুগযুগান্তর ধরিয়া মহিলাগণ অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকিলেও প্রয়োজনানুসারে তাঁহারা মুক্ত ভাবে স্বর্গের দেবীর ন্যায় লোকের কষ্ট দূর করিতে পারেন। যাঁহারা বলেন, অন্তঃপুরের মহিলাদিগের অবরোধ মোচন করিলে তাঁহারা নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িবেন, মহিলাদিগের এই কৃতকার্য্যতা তাঁহাদের উক্তির প্রবল প্রতিবাদ। মহিলাগণ এই জলপ্লাবনক্লিষ্ট লোকের সাহায্য করে পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন এবং সকলেই বলিতেছেন, "হায়দ্রাবাদের জলপ্লাবনসাহায্য ভাণ্ডারের" অর্থের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার নারীদিগের হস্তেই হইয়াছে।

সম্প্রতি বোম্বাইয়ে একটী দানশীলা মহিলার মৃত্যু হইয়াছে। ইনি পরলোগত জুমনদাস লালুভাইয়ের স্ত্রী। ইঁহার নাম লাদকোর বাই। ইনি আর্থার-রোড হাঁসপাতালে একটী বসন্ত রোগীর বিভাগ নির্ম্মাণ জন্য পঁচিশ হাজার টাকা দিয়া স্বামীর নামানুসারে তাহার নামকরণ করিয়াছেন। কেপোল অনাথাশ্রমে তিনি বার হাজার টাকা দিয়াছেন। তাঁহার উইলে দরিদ্রদিগের জন্য তিন লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। এই টাকা হইতে এক লক্ষ টাকা দ্বারা একটী ফণ্ড হইবে। এই টাকার সুদে তাঁহার স্বশ্রেণীস্থ দরিদ্র বিধবাগণকে সাহায্য করা হইবে। ৫১ হাজার টাকাতে তাঁহার স্বামীর নামে একটী অনাথাশ্রম স্থাপিত হইবে। ৫০ হাজার টাকায় স্বামীর নামে একটী লাইব্রেরী স্থাপিত হইবে। তাঁহার একটী কন্যা ও এক ভাই এবং বহু আত্মীয় বন্ধুবান্ধব জীবিত আছেন। বঙ্গদেশে এরূপ দান দেখা যায় না।

নাগপুরে সম্প্রতি যে সুবৃহৎ শিল্পপ্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে তাহাতে নারী শিল্পবিভাগ অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

জাঞ্জিরার বেগম সাহেবা ও তাঁহার ভগিনী শ্রীমতী বেগম জেহুয়া ফৈজির প্রেরিত দ্রব্যগুলিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। এই সকল দ্রব্যের মধ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্যের জরির কাজ, মৌলিক আদর্শ, সাটিনের উপর নানারূপ কাজ ইত্যাদি প্রেরিত হইয়াছিল। এই দ্রব্যগুলি সমস্তই বেগম সাহেবার পরিবারের মহিলাগণের দ্বারা নির্ম্মিত।

ভবনগরে রাজকুমারী কুনবেরী শ্রী প্রেরিত শিল্পগুলি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। ইঁহার বয়স ১১ বৎসর মাত্র। ইনি স্বর্ণপদক পুরস্কার পাইয়াছেন। ভবনগরের আর একটী রাজকুমারী এবং আর একজন সর্দ্দার-মহিলা রাণী শ্রীনন্দকুনবেরবা সাহেবাও অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর শিল্প দ্রব্য পাঠাইয়াছিলেন।

রাজনন্দ গাঁওয়ের রাণী একটি স্বর্ণের জরির কাজ পাঠাইয়াছিলেন। গত শত বৎসরের মধ্যে এরূপ কাজ এদেশে আর হয় নাই। নাগপুরের কনিষ্ঠা ভোঁস্‌লে রাণীগণ কতকগুলি প্রাচীন জরির কাজ পাঠাইয়াছিলেন, তাহার মূল্য এগার হাজার টাকা। গোয়ালিয়রের রাজমাতা স্বহস্ত-নির্ম্মিত জরির কাজ, জাঞ্জিরার বেগম অতি মনোহর প্রণালীতে পোষাক-পরিহিত পুতুল ও শ্রীমতী চিৎনবিস স্বহস্তে প্রস্তুত কিংখাব প্রেরণ করিয়াছিলেন। নাগপুরের পার্শী, বাঙ্গালী ও মুসলমান মহিলারা অনেক দ্রব্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রবীণা মহারাষ্ট্র মহিলাগণও অনেক জিনিষ পাঠাইয়াছিলেন।

---

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

দদ্রুনাশক চূর্ণ।

ইহাদ্বারা সর্ব্বস্থানের সর্ব্বপ্রকার দদ্রু ও কৌচদাদ প্রভৃতি উপশমিত হয়। ইহাতে পারদাদি কোন দূষিত পদার্থ নাই, এবং ব্যবহারেও কোন জ্বালা যন্ত্রণা অনুভূত হয় না। সর্ব্ববিধ দুরারোগ্য দদ্রুতে অনেকানেক ঔষধ ব্যবহার করিয়াও যাঁহারা ফল পান নাই, এই ঔষধ এক শিশি ব্যবহার করিলেই তাঁহারা সুফল পাইতে পারেন। এক শিশির মূল্য ।৹ আনা; ডাঃ মাঃ প্যাকিং ৶৹ আনা।



পদ্মমধু।

ইহা নেত্ররোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহাদ্বারা চক্ষুর অল্প দিনোৎপন্ন ছানি, দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য, জলস্রাব, রক্তাক্ততা, ও অধিমাংশ প্রভৃতি নানাবিধ নেত্র রোগ আরোগ্য হইয়া চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি পায়। ইহা বহু পরিশ্রমে ও বহু অর্থ ব্যয়ে আমরা সংগ্রহ করিয়া থাকি। ইহা অকৃত্রিম এবং সর্ব্বস্থানে পাওয়া অসম্ভব। ১ এক তোলার মূল্য ১৲ এক টাকা।

কেশরঞ্জন কে না চায়?

সুন্দরী বলেন—"কেশরঞ্জন না হইলে চুল বাঁধিব না।" সুন্দর যুবক বলেন—"কেশরঞ্জন না হইলে চুল খারাপ হইয়া যাইবে!" যিনি মস্তিষ্ক আলোড়ন করিয়া জীবিকার্জ্জন করেন, তিনি বলেন,—"মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে "কেশরঞ্জন" চাই। "কেশরঞ্জনের" কথা এখন সকলেরই মুখে। কেন, বলুন দেখি? কারণ—"কেশরঞ্জন" ভেষজ-গুণান্বিত মস্তিষ্ক-শীতলকারী মহাসুগন্ধি মহোপকারী কেশ তৈল। কারণ—কেশ বৃদ্ধি করিতে, কেশচিক্কণ করিতে, কেশ মূলের ক্ষয়সাধন নিবৃত্তি করিতে "কেশরঞ্জই" অদ্বিতীয়। যে "কেশরঞ্জনের" কথা সকলের মুখে আপনি কি তাহা ব্যবহারে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন?

এক শিশি ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি পাঁচ আনা। তিন শিশি ২।৹ দুই টাকা চারি আনা; মাশুলাদি এগার আনা। ডজন ৯৲ নয় টাকা; মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অশোকারিষ্ট।

সর্ব্ববিধ স্ত্রীরোগে একমাত্র বহু পরীক্ষিত মহৌষধ। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে রমণীকল্যাণকর বহুবিধ বহুমূল্য ঔষধাদির সমাবেশ আছে। রমণী নানারূপে জননী, ভগিনী, জায়ারূপিণী। রমণী হিন্দু-সংসার লক্ষ্মী।

মূল্য প্রতি শিশি (এক কৌটা বটিকা সমেত)		১॥৹ দেড় টাকা।৹
প্যাকিং ও ডাকমাশুল	... ...	।৶৹ সাত আনা।

হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগণের ব্যবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে আমি স্বয়ং ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং,

স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত, প্যারিস্ কেমিক্যাল সোসাইটি, লণ্ডন সার্জ্জিক্যাল এড্

সোসাইটী, ও লণ্ডন সোসাইটী অব্ কেমিক্যাল ইণ্ডষ্ট্রীর সভ্য,

গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমা প্রাপ্ত,

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজ।

১৮।১ ও ১৯ লোয়ার চিৎপুর রোড,—কলিকাতা।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

BHARAT-MAHILA, Registered. No. C. 307

চতুর্থ ভাগ। চৈত্র, ১৩১৫। ১২শ সংখ্যা।

ভারত-মহিলা

সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

শ্রীসরযূবালা দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

সূচী।

BHARAT-MAHILA OFFICE—Wari, Dacca.

ভারত-মহিলা কার্য্যালয়—উয়ারী, ঢাকা।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।০ আনা] [বর্ত্তমান সংখ্যার মূল্য ।৵০ আনা।

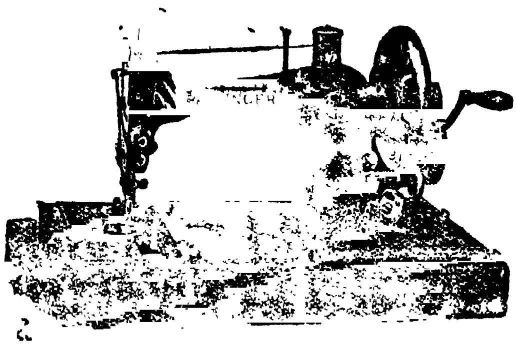
সিঙ্গারের শেলাইয়ের কল।

শেলায়ের কল অত্যন্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য ইহা সকলেই একবাক্যে বহুদিন হইতে স্বীকার করিয়া আসিতেছেন একণে যিনি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক তাহার প্রথম প্রশ্ন এই—কোন্ কল সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ?

প্রতি প্রৎসর লক্ষ লক্ষ সিঙ্গারের কল ক্রয় করিয়া প্রত্যক্ষ উপায়ে জনসাধারণ এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। আজ পর্য্যন্ত সিঙ্গার কোম্পানীর বিংশতি কোটীর উপর কল বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। ইহাতেই সকলে সিঙ্গারের কলের উৎকৃষ্টতা বুঝিতে পারিবেন। ইহার শিল্প কৌশল সর্ব্বোৎকৃষ্ট, গতি অতি দ্রুত, চালাইতে কিছুমাত্র পরিশ্রম নাই, ইহার শিক্ষাপ্রণালী অত্যন্ত সহজ, ইহা খুব মজবুত, দীর্ঘকাল স্থায়ী। তুলনায় উৎকৃষ্টতা বুঝিতে পারিয়া 'ভারত মহিলা' সম্পাদিকা স্বয়ং সিঙ্গারের কল ব্যবহার করিতেছেন।

সহজ শেলাই, নানা রকমের বিচিত্র শেলাই, ছোট ও বড় উভয় প্রকারের বখেয়া ও শিকলের স্থায় শেলাই প্রভৃতির উপযোগী চারি শত প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন কল আমরা প্রস্তুত ও আমদানী করিয়া থাকি।

যাহারা একবারে পূর্ণ নগদ মূল্যে কল ক্রয় করিতে সমর্থ নহেন তাহারা মাসিক কিস্তিবন্দীর নিয়মে ধারে কল লইতে পারেন।



	মূল্য—নগদ	কিস্তীবন্দী হিসাবে ধারে।
৪৮ কে হাতকল	৫০৲	৬০৲
ঐ পা কল	৬৮৲	৮০৲
২৮ কে ভি, এস হাত কল	৬০৲	৭০৲
ঐ পা কল	৭৫৲	৮৭৲

এই দুই প্রকার কলই গৃহকার্য্যে বিশেষ উপযোগী। কলের সঙ্গে আনুসঙ্গিক প্রয়োজনীয় সকল জিনিষই বিনামূল্যে দেওয়া হয়। কলের ঢাকনির মূল্য স্বতন্ত্র। গুণানুসারে ঢাকনির মূল্য ৯৲ হইতে ১৩৲ টাকা। দরজী-দিগের উপযোগী বিবিধ মূল্যের কল বিক্রয়ার্থ মজুত আছে। মূল্য নিরূপণ পুস্তক ও অন্যান্য বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রধান আফিস ৪নং ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতায় শাখা আফিস ১৫৮নং ধর্ম্মতলা, মফঃস্বলে শাখা আফিস ঢাকা, কুমিল্লা, রংপুর জলপাইগুড়ি, নাটোর, গৌহাটী, দার্জ্জিলিং, ডিব্রুগড়, বরিশাল ও খড়্গপুর।



পঞ্চম বৎসরের ভারত-মহিলা।

আগামী বৎসরে ভারত-মহিলার আকার আর এক ফর্ম্মা অর্থাৎ আট পৃষ্ঠা বর্দ্ধিত হইবে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ২।৶৹ দুই টাকা দশ আনা দিতে হইবে।

অতঃপর ভারত-মহিলা কার্য্যালয়, উয়ারী, ঢাকা, এই ঠিকানায় স্থানান্তরিত হইবে। এখন হইতে সকলে এই নূতন ঠিকানায় চিঠি পত্র ও টাকা কড়ি পাঠাইবেন। স্থান পরিবর্ত্তনের গোলমালে আমরা এবার বৈশাখ মাসে ভি, পি, পাঠাইতে পারিব না। সকল পুরাতন গ্রাহকের নিকটই বৈশাখ সংখ্যা নমুনা স্বরূপ প্রেরিত হইবে। যাঁহারা পত্রিকা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিবেন না, তাঁহারা ১৫ই বৈশাখ মধ্যে আমাদিগকে জানাইলে বাধিত হইব। যথা সময়ে না জানাইয়া শেষে ভি, পি, ফেরত দিয়া কেহ আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না, এই নিবেদন।

ভারত-মহিলা কার্য্যাধ্যক্ষ।
ভারত-মহিলা কার্য্যালয়, উয়ারী, ঢাকা।

ভারত-মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে
রমন্তে তত্র দেবতা।

The woman's cause is man's ; they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free ;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow ?

Tennyson.

৪র্থ ভাগ। } চৈত্র, ১৩১৫। { ১২শ সংখ্যা।

ভারত-নারী ও হিন্দু নীতিবিজ্ঞান।

ভগিনিগণ, হিন্দুনারী সুদৃঢ় পর্ব্বতের ন্যায়, যাহাতে ঝটিকাপ্রপীড়িত হিন্দু-পুরুষ শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিয়া ধ্বংসও জাতীয়তাভ্রংশ রূপ সাগরের গ্রাস হইতে রক্ষা পাইতেছে—এ কথা বলিলে বোধ হয় কিছুই অত্যুক্তি করা হয় না।

বিগত সহস্র বৎসর যাবৎ হিন্দু-হৃদয়ের উপর দিয়া মহাবেগবান অসংখ্য ঝটিকা প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে; কেবল আমরাই—হিন্দুনারীগণ—পুরুষদিগের মনকে জাতীয়তার চিরসম্মানিত ভিত্তি-ভূমিতে অটল রাখিয়াছি। কিন্তু—"The old order changeth,yielding place to to new." পুরাতনের পরিবর্ত্তন হয়, নূতন তাহার স্থান অধিকার করে। আমরাও এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে পড়িয়াছি। আমরা জীবনের এক নূতন অবস্থায়, সম্পূর্ণ নূতন উপকরণের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি—এবং তাহা আমাদের রীতি নীতি ও চরিত্রে ঘোর পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে চেষ্টা করিতেছে। যে সকল পরিবর্ত্তন আমাদের অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়া, আমাদিগকে একটী প্রকৃত জাতিতে পরিণত করিবে, আসুন আমরা সেই সকল পরিবর্ত্তনকে সাদরে অভ্যর্থনা করি। কিন্তু যে সকল পরিবর্ত্তন আমাদিগকে আমাদের জাতীয়তা হইতে বিচ্যুত করিতে চায় আমরা তাহার বিরুদ্ধে বাধা প্রদান করিব। ভারতনারী তাহার জ্ঞানালোকে যতটুকু পারিয়াছে অতীত ও বর্ত্তমানে তাহার ভ্রাতাগণকে সকল সংগ্রামে সাহায্য করিয়াছে এবং করিতেছে। কিন্তু ভগিনিগণ, আসুন আমরা দেখি, এই সুমহৎ সহায়তা কার্য্যের জন্য আমরা আরো অধিকতর উপযুক্ত হইতে পারি কি না। এই যুগসন্ধি স্থলে—এই সমস্যাপূর্ণ সময়ে ভারতনারী তাহার ভ্রাতাদিগের কতটুকু সাহায্য করিবে—আসুন আমরা তাহা আলোচনা করি।

আমার বোধ হয়, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ নারীদিগকে যে শিক্ষা দিতেন, বর্ত্তমান সময়েও ভারতনারীর পক্ষে সেই শিক্ষাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অবশ্য বর্ত্তমান কালের উপযোগী কিছু কিছু পরিবর্ত্তন তাহাতে করিতেই হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুনারীর যেরূপ হওয়া উচিত তাঁহারা তাহাই হইয়াছেন—এ কথা বলা যেমন নিতান্তই সত্যবিরুদ্ধ হইবে, তেমনি তাঁহারা সম্পূর্ণ অশিক্ষিত —এ কথা বলাও ঠিক নহে। তাঁহারা সুপণ্ডিতা না হইতে পারেন, বৈজ্ঞানিক অঙ্গচালনা তাঁহারা না করিতে পারেন, অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব তাঁহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকিতে পারে; এক কথায়, স্বামীর উপযুক্ত পত্নী, গৃহের সুদক্ষ গৃহিণী, সন্তানের সাবধান ও বুদ্ধিমতী মাতা এবং রাজ্যের রাজভক্ত উপযুক্ত প্রজা হইতে যে যে গুণের আবশ্যক, তাহার অনেক গুণই তাঁহাদের না থাকিতে পারে, কিন্তু মানসিক ও নৈতিক উন্নতি সাধন বিষয়ে নারীদের ধর্ম্মগ্রন্থাদি শ্রবণ সম্পূর্ণ বৃথা গিয়াছে, এরূপ বলা যাইতে পারে না।

আমাদের প্রাচীন ইতিহাস এবং প্রাচীন মহাকাব্য পাঠে আমরা অনেক আদর্শ-নারীর বিষয় জানিতে পারি, যাঁহারা সতীত্ব, পতির প্রতি অনুরাগ, ধর্ম্মপরায়ণতা, লজ্জাশীলতা ও আত্মোৎসর্গের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। আমরা ঐ সূত্রেই আরো জানিতে পারি যে, আমাদের প্রাচীন কালের ভগিনিগণ প্রাচীন আর্য্য-সমাজের উপর যথেষ্ট প্রভাব পরিচালনা করিতেন এবং আর্য-চরিত্রের বিকাশে তাঁহাদের যথেষ্ট হাত ছিল। নারীর কর্ত্তব্য ও দায়িত্বের উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া প্রাচীন আর্য্যগণ নারীদিগকে এমন শিক্ষা দিতেন যাহাতে তাঁহারা পরিবার ও সমাজের উপযুক্ত সভ্য হইতে পারিতেন।

বর্ত্তমান সময়ে সমস্ত জগতের উপর পাশ্চাত্য উন্নতির একটা প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছে। তাহা উপেক্ষা করিলে চলিবে না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় আদর্শ নারী-জীবনে কিরূপে সুচারুরূপে মিলিত হইতে পারে এখন তাহাই দেখিতে হইবে।

যে সকল পাশ্চাত্য লেখক ও চিন্তাশীল লোক ভারত-নারীকে দেখিবার ও ভাল করিয়া বুঝিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারা ভারত-নারীর কতকগুলি উৎকৃষ্ট গুণ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। তাঁহারা ভারত-নারীর সুরঞ্জিত শাড়ী, হীরামণিমুক্তার অলঙ্কার অথবা অল্প-বিদ্যার বাহ্য চাকচিক্য দেখিয়া ভুলেন নাই, কিন্তু মানবের প্রকৃত কল্যাণ ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের উপযোগী কিছু মূল্যবান গুণ তাঁহাদিগের মধ্যে দেখিতে পাইয়াছেন, এই জন্যই এই প্রশংসা। তাঁহারা লজ্জাশীলা, সুনম্র-প্রকৃতি কুমারী, অনুরাগিনী পত্নী, স্নেহময়ী জননী ও দয়াশীলা নারী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। কিরূপে তাঁহারা এই প্রশংসার অধিকারী হইলেন? চরিত্রের এই সকল গুণ তাঁহারা কোথা হইতে লাভ করিলেন? বর্ত্তমান সময়ের তরল ও অসার সাহিত্য হইতে কি তাঁহারা এই সকল মহৎগুণ লাভ করিয়াছেন? —নিশ্চয়ই নয়। বিদ্যালয়ের যৎসামান্য পুস্তক-শিক্ষা হইতে কি তাঁহারা এ সকল গুণ অর্জ্জন করেন?—খুব সম্ভবত নহে। বরং এই শিক্ষা কাহাকে কাহাকেও তরল-প্রকৃতি এবং অহঙ্কারী করিয়া তুলিয়াছে।

প্রকৃত কথা এই যে, আমাদের হিন্দু ভগিনীগণ যুগ যুগান্তর ধরিয়া চির সম্মানিত হিন্দুনীতি রূপ পবিত্র মহানদীর অমৃত-বারি প্রচুর পরিমাণে পান করিতেছেন। এ বিষয়ে পুরুষগণ অপেক্ষা আমরা অধিক ভাগ্যবতী। এই মহানদীর উৎস—প্রাচ্য দেশের পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ,— রামায়ণ, মহাভারত, বেদান্ত, উপনিষদ এবং ভগবদ্গীতা। এই নীতিশিক্ষা পুস্তক পাঠে অথবা বিদ্যালয়ে লব্ধ হয় নাই, শ্রুতিযোগে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। আমরা যদি এখন সংকল্প করি, আমরা সংস্কৃত শিখিয়া নিজেরাই এই সকল পবিত্র গ্রন্থ পাঠ করিব, তাহা হইলে দুই এক পুরুষ পরে ভারতনারীর অবস্থা কিরূপ হইবে বলিয়া আপনারা মনে করেন? নিশ্চয় জানিবেন, ভারতবর্ষ পুনরায় সীতা, সাবিত্রী, গার্গী ও কৌশল্যায় পূর্ণ হইবে।

আমাদের সংস্কৃত সাহিত্য অমূল্য রত্নখনি। আমাদের জীবনের প্রত্যেক কার্য্য সম্বন্ধে আমরা তাহা হইতে আলোক ও উপদেশ সংগ্রহ করিতে পারি। আমাদের ধর্ম্ম-গ্রন্থে মহাসত্য—সার্ব্বভৌমিক সত্য সকল নিহিত আছে।

ইহকাল ও পরকালে সুখী হইবার পন্থা তাহাতে লিখিত রহিয়াছে। ভগিনিগণ, আমার বিশ্বাস আপনারা আমা অপেক্ষা ঐ সকল মহাগ্রন্থের মূল্য বেশী বুঝিতে পারেন। যথাযথ রূপে এই সকল গ্রন্থের গুণ বর্ণন করিতে পারি—আমার সেই ক্ষমতা নাই। আমার মনে হয়, আমাদের অন্তরে নীতিজ্ঞানের বিকাশের জন্য সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠই পর্য্যাপ্ত।

যদি ভারতবর্ষ জাগ্রত হইয়া জগতের সমক্ষে আপনার আধ্যাত্মিকতা প্রচার করে তবে তাহা সুশিক্ষিতা পত্নী ও জননীগণের (যাহারা ভবিষ্যদ্বংশকে গঠন করিবে) সাহায্যেই করিবে। ভারতীয় আদিম আর্য্যগণ মহৎ আকাঙ্ক্ষা ও উচ্চ নীতি দ্বারা পরিচালিত হইতেন। আমাদের প্রাচীন মহাকাব্যদ্বয় মহৎ ভাবের উদ্দীপক। আধুনিক নাস্তিকতা ও জড়বাদের দিনে আমাদের পক্ষে আর্য্য পূর্ব্বপুরুষগণের সদ্গুণাবলী জীবনে অনুষ্ঠান করা কঠিন হইতে পারে, কিন্তু এমন অনেক মহাপুরুষ ও মহানারী জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা আর্য্যগণের উন্নত আদর্শকে জীবনে কার্য্যে পরিণত করিয়া গিয়াছেন। আমাদের মধ্যে এমন অনেক নারী জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা, কবিত্ব, সাহিত্য, ও দর্শনশাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াও নারীর উচ্চ আদর্শ হইতে বিচ্যুত হন নাই। তামিল দেশে নারীর মধ্যে আব্বাই এবং পুরুষের মধ্যে তিরুবেল্লুবার তিরুজ্ঞান সম্বন্দর, মাণিক্য বাসাগর এবং তিরুকুরলের নাম করিতে পারি। অমূল্য উপদেশ-রত্নের আকর তিরুবেল্লুবারের গ্রন্থখানিকে শ্রদ্ধা করে না এমন কে আছে? এবং শেষোক্ত মহাপুরুষগণের ভক্তিসংগীতে হৃদয় বিগলিত হয় না এমন মানুষই বা কোথায় আছে? তিরুবেল্লুবারের সহধর্ম্মিনী বাসুকী আদর্শ সহধর্ম্মিনী ছিলেন। স্ত্রী, পুত্র ও ভ্রাতার কর্ত্তব্য রামায়ণ ও মহাভারতে অতি পরিষ্কার রূপে বিবৃত হইয়াছে। আমাদের মহাকাব্যের নায়ক নায়িকাগণ নানা সদ্গুণে ভূষিত। ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয় এই কাব্যদ্বয়ে সুস্পষ্ট রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে আমাদের তরুণীগণ মাতৃভাষায় লিখিত তরল উপন্যাসাবলী পাঠ করিতে ভালবাসে। এই সকল পুস্তকে সাধারণতঃ কোন উচ্চ নীতি উপদেশ থাকে না, অধিকাংশই কুরুচির পরিচায়ক। পিতা-মাতার কর্ত্তব্য যে এই সকল অনিষ্টকর পুস্তক সন্তানদিগের হস্তে যাহাতে যাইতে না পারে সে বিষয়ে সতর্ক হওয়া। আর এই সকল লেখকগণও নানাপ্রকার উপকারী সংস্কৃত ও ইংরেজী গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া সময় ও শক্তির সদ্ব্যবহার করিতে পারেন।

চরিত্রই জাতীয় শক্তি। বহু দিনের আলস্য ও অধীনতায় আমরা যাহা হারাইয়াছি তাহা আমাদিগকে পুনরায় লাভ করিতে হইবে। উন্নত ও কল্যাণকর ব্রিটিশ শাসনের অধীনে থাকিয়া আমরা আমাদের প্রকৃত অভাব দেখিতে পাইতেছি এবং সেই ক্ষতি পরিপূরণের জন্য সচেষ্ট হইতেছি।

বর্ত্তমান সময়ে জীবন নানা জটিলতায় পূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। নানা কঠিন সমস্যা জীবনে পূর্ণ করা আবশ্যক হইয়াছে। আমাদের ভ্রাতাগণ সমাজ, অর্থবিজ্ঞান, শিল্পবিজ্ঞান ও রাজনীতি বিষয়ে নানা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন। অনেক দোষ ক্রটী বর্জ্জন করিতে পারিলে তবে ভারতবাসী অন্যান্য জাতির সম্মানের অধিকারী হইতে পারিবে। অনেক সামাজিক কুপ্রথা দূর করিতে হইবে, অনিষ্টকর জাতিভেদ প্রথা ও তদনুষঙ্গিক বিবিধ অকল্যাণকর সংস্কার দূর করিতে হইবে, ভারতের বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের মধ্যে মিলন সংঘটিত করিতে হইবে, বাল্যবিবাহ দমন করিয়া জাতিটীকে সবল করিতে হইবে। শিল্প বিজ্ঞান ও আর্থিক উন্নতিতে আমরা অন্যান্য জাতির অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছি। আমরা আমাদের ভ্রাতাগণকে দশজনে মিলিয়া ব্যবসায় বাণিজ্য করিতে (যৌথ কারবার) উৎসাহিত করিব। উদ্বৃত্ত অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে আমরা তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিব। অলঙ্কার ও বিবিধ বিলাস-দ্রব্যে অর্থব্যয় করিতে আমরা তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিব। নিম্নশ্রেণীর অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে হইবে, এবং অনেক কোণে কোণে লুকানো আঁধার দূর করিবার জন্য আলো জ্বালিতে হইবে। আমা-

দের ভ্রাতাগণকে তাঁহাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা জীবনের পরিণত করিতে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে। আমরা—ভারতনারীগণ—এই সুকঠিন কর্ত্তব্য সাধনে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে উপযুক্ত হইয়াছি কি? প্রাচীন ভারতের নারীগণ জীবনের কঠিন সংগ্রামে এই প্রকার অসাড় ও নিস্পন্দ হইয়া বসিয়াছিলেন কি? তাঁহারা কি আমাদের ন্যায় শুধু শাড়ী ও অলঙ্কার-পরিহিতা পুতুলের ন্যায় সমাজে বিচরণ করিতেন? না, নিশ্চয়ই নহে। তবে আমরাও কেন উঠিব না? আমরাও কেন আমাদের ভ্রাতাগণের প্রকৃত কর্ম্মোৎসাহিনী সাহায্য-কারিণী হইব না? নারীর ও পুরুষেরই ভাগ্য একই সূত্রে গাঁথা। তাহারা একই সঙ্গে উঠে, একই সঙ্গে অধঃপতিত হয়। আমরা যদি পশ্চাতে টানিতে থাকি তবে আমাদের ভ্রাতাগণ সম্মুখে অগ্রসর হইবেন কি করিয়া? দুর্ভাগ্য এই, আমরা আবার সংখ্যায় তাঁহাদের অপেক্ষা অধিক। আসুন, আমরা সুশিক্ষা লাভ করিয়া উন্নতির স্রোতকে বলশালী করি। আমরা আমাদের জাতীয় সদ্গুণাবলী রক্ষা করিব, আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া আমাদের ধর্ম্মজ্ঞান আরো বৃদ্ধি করিব। অন্যান্য দিক হইতেও আমরা জ্ঞানসম্পদ আহরণ করিব। ইংরাজী অধ্যয়ন করিয়া আমরা ভারতীয় জ্ঞান-ভাণ্ডারের বাহিরে যে জ্ঞান আছে তাহাও সংগ্রহ করিব। আমাদের অন্ততঃ এতটুকু শিক্ষিত হওয়া উচিত, যাহাতে স্বামীর উপযুক্ত সঙ্গিনী হইতে পারি, শিশুদিগের ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু হৃদয়বৃত্তি-গুলিকে উপযুক্ত পথে পরিচালিত করিতে পারি, সুদক্ষ গৃহিনী এবং রাজ্যের উপযুক্ত প্রজা হইতে পারি।

আমাদিগকে ইংরাজী শিক্ষায় বঞ্চিত করিয়া জ্ঞানের এক সুপ্রশস্ত রাজ্য যাঁহারা আমাদিগের নিকট অবরুদ্ধ রাখিতে চাহেন তাঁহাদের সহিত আমার সহানুভূতি নাই। আমি তাঁহাদের সহিত এক মত নই। আমাদের ভ্রাতাগণ যে জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছেন তজ্জন্য ইংরেজী শিক্ষার নিকট কতই ঋণী। যে জ্ঞান-ফল আমাদের ভ্রাতৃগণের পক্ষে নিষিদ্ধ হয় নাই, আমরা কেন তাহার আস্বাদনে বঞ্চিত থাকিব? নারী অপূর্ণ পুরুষ নহে, নারীর প্রকৃতি স্বতন্ত্র (woman is not undeveloped man but diverse)—এই কথা স্মরণ রাখিয়া চলুন আমরা ততটুকু ইংরেজী শিক্ষা লাভ করি, যাহাতে আমরা জগতের উপযুক্ত অধিবাসী হইতে পারি; আমরা সাবধান থাকিব যে আমাদের প্রকৃতি ও ব্যবহার নারীজন-বিরুদ্ধ না হইয়া পড়ে। আর যে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের শান্তিপূর্ণ শাসনাধীনে রাজা ও প্রজা উভয়ের অন্তরে ভারত-নারীর উন্নতি সাধনের ইচ্ছা ও চেষ্টা জাগ্রত হইয়াছে, আসুন সেই রাজত্বের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা পোষণ করি। ভগবান আমাদের লক্ষ্য সাধনে সহায় হউন।*

আহ্বান।

আঁধার মগন গগনে আমার
আন গো উষার আলো,
আমার ভুবনে আজি নির্ম্মল
কিরণের ধারা ঢালো।
নীরব কাননে যত পাখী
যেন গো আবার উঠে ডাকি',
তোমার আলোকে হেরি' ধরণীরে
ফিরে' যেন বাসি ভালো।

শিশির-শীর্ণ কুঞ্জে আমার
আন গো মলয় বায়,
শুষ্ক লতিকা নব কিশলয়ে
যেন পুন ছেয়ে যায়।
শুভ্র কুসুম বন ভরে'
ফুটে' উঠে যেন থরে থরে,
মুকুলিত তরু মর্ম্মর সুরে
সান্ত্বনা গাথা গায়।
শিশির-শীর্ণ কুঞ্জে আমার
আন বসন্ত-বায়।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

---

* মান্দ্রাজে ভারত-মহিলা পরিষদের অধিবেশনে মেডিকেল কলেজের ছাত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মী আম্মল প্রদত্ত বক্তৃতার মর্ম্ম।

ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা।

কলিকাতায় আচার্য্য অমরেন্দ্রনাথ সেনের বাড়ীর সাধন-কুটীরে আচার্য্য একা।

ঢাকায় পরেশ বাবু তাঁহার বন্ধুগণকে লইয়া যে মহৎ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন তাহা দেখিয়া গত কল্য তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। আজ সারা দিন এই কুটীরে উপাসনায় কাটাইয়াছেন। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। প্রণামান্তর তিনি উঠিয়া বসিয়াছেন। এইখানে বসিয়া জাগিয়া জাগিয়া এক আশ্চর্য্য দৃশ্য যেন তাঁহার চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

সর্ব্ব প্রথমে তিনি দেখিলেন—তিনি নিজে জগত-জননীর অনেক নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন এবং তাঁহার দৈনিক কর্ত্তব্য তিনি প্রেম ও বিশ্বাসের সহিত সম্পন্ন করিতেছেন। তিনি দেখিলেন- সরলা এবং নলিনী শত শত বালিকাকে নিজেদের প্রকৃতির অনুরূপ করিয়া গড়িয়া তুলিতেছেন। সরলা এবং সুধীর শুধু এক-হৃদয় নয়—এক-আত্মা হইয়া ধর্ম্ম সাধন করিতেছেন এবং তাঁহাদের মিলিত শক্তি সম্পূর্ণরূপে দেশের কাজে উৎসর্গীকৃত। 'দেশ-সেবা' তাঁহাদের ব্রত! তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি ভালবাসা তাঁহাদের ঈশ্বরপ্রেমকে দিন দিন উজ্জ্বলতর এবং পবিত্রতর করিতেছে।

তিনি দেখিলেন—অধ্যাপক আনন্দমোহন তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, ও সর্ব্বস্ব দিয়া জাতীয় বিদ্যালয়কে সফল করিয়া তুলিয়াছেন। দেশের যুবকদলের উপর তাঁহার প্রভাব অসামান্য। অধ্যাপকের নামে তাঁহাদের মস্তক ভক্তিতে অবনত হয়। পবিত্র, বিদ্বেষহীন, খাঁটি স্বদেশপ্রেম তিনি তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। এখানে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের পবিত্র মিলনক্ষেত্র হইয়াছে!

তিনি দেখিলেন, নবীনচন্দ্র দাস পারিবারিক জীবনে অনেক সংগ্রাম বহন করিতেছেন কিন্তু কখনও পথভ্রষ্ট হন নাই। কণ্টকময় সংসারপথে বিচরণ করিতে করিতে তাঁহার চরণদ্বয় ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে কিন্তু দয়াময় ঈশ্বর স্বহস্তে ধর্ম্মের মহিমাতে তাঁহার ললাট উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছেন।

তিনি দেখিলেন—কালীমোহন গুপ্ত 'ভারত-ভাণ্ডারে' আপন কাজ করিতেছেন। দুঃখী আর্ত্তকে ধরিয়া তুলিবার জন্য তাঁহার স্নেহ-হস্ত সর্ব্বদাই প্রস্তুত। তিনি দেশবাসীর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা লাভ করিতেছেন।

তিনি দেখিলেন—অরবিন্দ সেনের আশা এবং বিশ্বাস পূর্ণ হইয়াছে। 'দৈনিক' এখন জাতীয় সংবাদপত্র-জগতের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছে।

তিনি দেখিলেন—সুরেশচন্দ্র বসু শুষ্ক ধর্ম্মহীন জীবন যাপন করিতেছেন। নিজেকে ভুলাইবার জন্য তিনি নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদে যোগ দিতেছেন, কিন্তু তাঁহার প্রত্যেক কার্য্য তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে যে তিনি তাঁহার দেবতাকে অস্বীকার করিয়াছেন।

তিনি দেখিলেন—পূর্ব্ববঙ্গে পরেশবাবু, তাঁহার পত্নী এবং তাঁহাদের কয়েক জন সহকারী ধর্ম্মসাধন ও জগতের সেবা করিতেছেন। আর দেখিলেন তাঁহারা একটি 'সন্তান দল' গঠন করিয়াছেন। এই সন্তানদল এখন আশ্রমে সাধনাধীন। সাধনান্তে এই তরুণ তপস্বী-দল যখন কার্য্যে বাহির হইবেন, তখন তাঁহাদের অন্য চিন্তা থাকিবে না, অন্য কার্য্য থাকিবে না, ইঁহাদের চিন্তা হইবে 'ভারত-মঙ্গল', ইঁহাদের কার্য্য হইবে, 'স্বদেশসেবা,' ইঁহাদের লক্ষ্য হইবে, ভারতে ধর্ম্মরাজ্যকে সফল করিয়া তোলা। এই দৃশ্য দেখিয়া আচার্য্যের হৃদয় আনন্দে এবং কৃতজ্ঞতায় ঈশ্বরকে শত ধন্যবাদ দান করিল।

তিনি দেখিলেন—হিংসা, অপ্রেম দূর হইয়াছে, ভারতের ভবিষ্যৎ আশা যুবকবৃন্দ সকল প্রকার হালকা ভাব ত্যাগ করিয়া পবিত্র, গম্ভীর ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়া স্বদেশ-জননীর সেবা করিতেছেন এবং ভারত-মাতার কন্যাগণ বিলাসিতা, নীচতা দূরে ফেলিয়া তাঁহাদের সাহায্য করিতেছেন। ভারতের নরনারী ভারতের পুণ্য-তপোবনে ধর্ম্ম সাধন ও ভাই ভাই এক ঠাঁই হইয়া ঈশ্বরের কাজে জীবন কাটাতেছেন।

তিনি দেখিলেন—সমগ্র ভারতে এক মহা ধর্ম্মরাজ্য স্থাপিত হইয়াছে। (সমাপ্ত)

শ্রীনির্ঝরিণী ঘোষ।

ইংরাজ-বালিকার শিক্ষা।

ইংরাজ-বালকের শিক্ষা প্রণালী ইতিপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের বালিকা-জীবন সম্বন্ধে এখন কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

পূর্ব্বে অধিকাংশ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-পরিবারের বালিকাগণকে বোর্ডিং-স্কুল বা কলেজে প্রেরণ করা হইত। কিন্তু এখন প্রায় প্রতি সহরেই বালিকাদিগের শিক্ষালাভের উপযোগী উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় (High School) স্থাপিত হওয়াতে পিতামাতা কন্যাগণকে আর গৃহ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া দূরে প্রেরণ করিতে চাহেন না, আপনাদের নিকটে রাখিতেই ভালবাসেন।

উভয় প্রণালীরই সুবিধা অসুবিধা দুই দিক আছে। যে বালিকা গৃহে থাকিয়া বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে সে অপেক্ষাকৃত অধিক স্বাধীনতা ভোগ করে, অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে অধিক সামাজিক হইয়া পড়ে, অনেক সভা সমিতিতে যোগ দেয় এবং তাহার অনেকটা স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়িবার আশঙ্কা থাকে। অনেক সময় গুরুজনদিগের প্রতি তাহার ব্যবহারও খুব ভাল দেখা যায় না।

সুপরিচালিত বোর্ডিং-স্কুলে নিয়ম প্রণালী (discipline) বিশেষ ভাবে প্রতিপালিত হয়। সেখানে বাহিরের কোন আকর্ষণ বালিকাদিগের মনকে অধ্যয়ন ও কর্ত্তব্য হইতে বিক্ষিপ্ত করিতে পারে না। তাহাদের আহার সাদাসিধে, কিন্তু তাহা পুষ্টিকর ও পরিমাণে যথেষ্ট। মুখরুচিকর মিষ্ট দ্রব্য সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না, প্রবেশ করিলেও তাহা পরিমাণে সামান্য, তাহাতে স্বাস্থ্যহানি হয় না। ভোরে গাত্রোত্থান এবং রাত্রে সকাল সকাল নিদ্রা যাইবার অভ্যাস করিতে হয়। সাধারণতঃ ৮ হইতে ২০ বৎসর বয়স্কা বালিকাগণকে রাত্রি ৮½টার সময় নিদ্রা যাইতে হয়। প্রতিদিন বালিকাগণকে শরীর চালনার জন্য খেলা করিতে হয়। কখন কখন তাহাদিগকে বেড়াইতে লইয়া যাওয়া হয়। দুটী দুটী করিয়া বালিকা এক এক সারি করিয়া পথে চলিতে থাকে, ২।১ জন শিক্ষয়িত্রী সতর্ক প্রহরীর ন্যায় তাহাদের সঙ্গে যান, রাস্তায় তাহারা কথা বলিতে পারে না। যখন কোন বাগানে বা মাঠে উপস্থিত হয় তখন শিক্ষয়িত্রীর আদেশ পাইয়া তাহারা শ্রেণীভঙ্গ করিয়া যায় তার প্রিয় সঙ্গীর গলা ধরিয়া মনের আনন্দে বেড়াইতে ও গল্প করিতে আরম্ভ করে। ভ্রমণ শেষ হইলে আবার শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বোর্ডিঙে গমন করে এবং অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়। বোর্ডিং-স্কুলে বালিকাগণ সর্ব্বক্ষণ—খেলাতেই হউক অথবা অধ্যয়ন সময়েই হউক—শিক্ষয়িত্রীর সতর্ক দৃষ্টির সম্মুখে থাকে। চাকর চাকরাণীর সহিত কথোপকথন নিষিদ্ধ। যে চিঠি বালিকারা লেখে বা যাহা তাহাদের নিকট আসে সকলই প্রধান শিক্ষয়িত্রী পাঠ করিয়া দেন। এই সকল কারণে বোর্ডিং-স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত বালিকাগণ অনেকটা স্বাভাবিকতা-বর্জ্জিত হইয়া পড়ে এবং ১৭।১৮ বৎসর বয়সে যখন তাহারা বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করে তখন যদিও তাহারা নানা বিষয়ে শিক্ষিত হয় বটে কিন্তু তাহাদের মন অনেকটা অবিকশিতই থাকে।

শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বালিকা সাধারণতঃ ১৭।১৮ বৎসর বয়সে মনের আনন্দে স্বগৃহে ফিরিয়া আসে। গৃহ যত উৎকৃষ্ট হয়, নিজের প্রকৃতি স্বভাবতঃ যত ভাল হয় বালিকার জীবন তত শীঘ্র নারীজনোচিত গুণাবলীতে ভূষিত হইয়া উঠে। দুর্ভাগ্য ক্রমে যদি তাহাকে অনেক অযথা-প্রশংসা করা হয় অথবা অনেক সামাজিকতার মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হয় অর্থাৎ বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে অতিরিক্ত মিশিতে, নাচ তামাসায় অধিক পরিমাণে যোগ দিতে দেওয়া হয় তবে তাহার বিকাশ অনেকটা বাধাপ্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে যদি বালিকা পরিবারে মাতার দক্ষিণ হস্ত রূপে দণ্ডায়মান হয় এবং তাঁহাকে গৃহিণীর কর্ত্তব্য-ভার হইতে কিয়ৎ পরিমাণে মুক্ত করে, কতকগুলি কর্ত্তব্য যথা নিয়মে সম্পন্ন করে, অধ্যয়নের জন্য সময় নির্দ্দিষ্ট রাখে, তবে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া বালিকার জীবন শীঘ্র শীঘ্রই বিকশিত হইয়া উঠে। কনিষ্ঠা ভগিনী থাকিলে বিদ্যালয়-ফেরত বালিকা তাহার পাঠশিক্ষাতে যথেষ্ট সাহায্য করে।

বোর্ডিং-স্কুলে বাস করিয়া বালিকাগণের উচ্চ শিক্ষা লাভ করা কতটা বাঞ্ছনীয় এ বিষয়ে অনেক চিন্তা করি-

বার আছে। কবিবর লংফেলো (Longfellow) বলিয়াছেন :—

"It is the heart and not the brain
That to the highest must attain."

অর্থাৎ মস্তিষ্কের বিকাশ অপেক্ষা হৃদয়ের বিকাশই অধিক প্রয়োজনীয়। বর্ত্তমান প্রণালীতে বোর্ডিং-স্কুলে থাকিয়া উচ্চশিক্ষা লাভ করিলে হৃৎবৃত্তির বিকাশ যে কিয়ৎ পরিমাণে বাধা প্রাপ্ত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। মুখস্থ বিদ্যা, পরীক্ষা পাশ, পুরস্কার লাভ ইত্যাদি দ্বারা অহঙ্কার ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা অনেক সময় অতিরিক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়, বালিকার চরিত্রে স্বাভাবিক সদ্‌গুণ অনেক অধিক না থাকিলে বোর্ডিংএর ছাত্রীগণের প্রকৃতি কতক পরিমাণে নারীজনোচিত কোমলতা-বর্জ্জিত হইয়া পড়ে প্রকৃত সদ্‌গুণাবলী অপেক্ষা মস্তিষ্ক-শক্তিই অধিক প্রশংসা লাভ করে।

কিন্তু গণিত শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা দ্বারা জীবনের কঠিন সমস্যা সকল মীমাংসা করা যায় না। সংসারে যত দিন দুঃখ, পাপ, দরিদ্রতা ও অজ্ঞতা এত অধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকিবে ততদিন সেই শিক্ষাই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, যাহাতে এই সকলের সহিত সংগ্রাম করিতে নারীকে সমর্থ করে। গৃহে শিক্ষার উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা না থাকিলে বালিকাগণকে অবশ্যই বোর্ডিঙে প্রেরণ করা আবশ্যক, কিন্তু বোর্ডিঙের শিক্ষার ত্রুটী যাহাতে দূর হয় জননীগণ গৃহে তজ্জন্য চেষ্টা করিবেন। ইংলণ্ডে অনেক নারীকে জীবিকার জন্য শিক্ষা লাভ করিতে হয়, কারণ তাহারা অনেকে চাকুরী করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে, সুতরাং ঠিক পুরুষদিগের মত তাহাদের অনেকের অবস্থা। কিন্তু তাহা হইলেও বালিকাদিগকে গৃহের কাজ কিছু কিছু করিতেই হয়। কখনও বালিকার উপরে তাহার পড়াশোনা সত্ত্বেও পরিবারের সমস্ত রিপুকর্ম্মের ভার দেওয়া হয়। কোন কোন স্থলে বালিকাকে তাহার নিজের এবং ভগিনীর পোষাক নিজেই প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। ইংরাজ-বালিকা খুব পরিশ্রমী, এবং তাহারা যাহা করে মনপ্রাণ দিয়াই করে। তাহাদের এই শ্রম দ্বারা যে শুধু তাহাদেরই উপকার হয় তাহা নহে, পারিবারিক অর্থও অনেক বাঁচিয়া যায়। সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর পোষাক-পরিহিতা বালিকারা অনেকেই নিজের দর্জ্জি নিজে। সুন্দর সুন্দর আদর্শ কিনিয়া তাহার অনুকরণে তাহারা পোষাকের কাপড় কাটে; কাটা কাপড়গুলি টাকিয়া পরিয়া দেখে গায়ে ঠিক লাগে কি না; তার পর শেলাই করে।

গৃহে দুই তিন ভগিনী থাকিলে তাহারা গৃহকর্ম্মের দুই তিনটী বিভাগ আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লয়। একজন হয়ত এক সপ্তাহ রান্নার ভার লইল, আর এক জন ঘরগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে, আসবাবের ধুলা ঝাড়িবে, ফুল সাজাইবে, রিপুকর্ম্ম করিবে, ইত্যাদি। পরের সপ্তাহে তাহারা কাজ বদলাইবে। কোন্ ভগিনী ভাল রান্না করে বাড়ীর বালকেরা তাহা পরিষ্কার করিয়াই জানাইয়া দেয়। তাহারা হয়ত বলিবে, "ও, এই সপ্তাহে জেসীর রান্না করিবার পালা! বা! কি মজা, সপ্তাহটা ভাল খাওয়া যাবে।" যে ভগিনী ভাল রান্না করিতে পারে না, সে হয়ত ভাইদের পেটুক বলিয়া নিন্দা করিবে কিন্তু তাহার রান্না যাহাতে ভাল হয় তজ্জন্য পর সপ্তাহে যে সে দ্বিগুণ চেষ্টা করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কোন কোন বালিকা গৃহকর্ম্মে সহজেই নিপুণা হইয়া উঠে, কেহ কেহ বা এই কার্য্যটী অত্যন্ত কষ্টকর মনে করে। কিন্তু মাতা উৎসাহ প্রদান করিলে ও কন্যাকে সুদক্ষ করিয়া তুলিবার সংকল্প করিলে ক্রমে তাহার পক্ষেও গৃহকর্ম্ম সহজসাধ্য হইয়া পড়ে।

ইংলণ্ডে ১২।১৩ বৎসর বয়স হইলেই বালিকাদিগকে নিজের একটী ক্ষুদ্র শয়নগৃহ দেওয়া হয়। এই গৃহটীর সম্পূর্ণ অধিকার সেই বালিকার। তাহার ইচ্ছামত সে সেখানে শয়ন করিতে, পাড়িতে অথবা প্রার্থনা করিতে যায়; সেই গৃহে অন্যের কোন অধিকার নাই। যদি একটী ঘর একটী বালিকাকে দেওয়া সম্ভব না হয় তবে তাহার প্রায় সমবয়সী আর একটী বালিকাকে সেই ঘরে দেওয়া হয়। ইংরাজ-বালিকা ও ইংরাজ-মহিলাগণ পুরুষদিগের সঙ্গে কথা

যাওঁা বলেন বটে, এবং অন্তঃপুরেও আবদ্ধ থাকেন না সত্য, কিন্তু তাঁহাদের প্রকৃত লজ্জাশীলতা এদেশের নারীগণ অপেক্ষা কম নহে। এদেশে সংস্কার-বিবাহ উপলক্ষে যে অশ্লীল আমোদ প্রমোদ হয় তাহা জাতীয় কুরুচির পরিচায়ক। পৃথিবীর কোন সভ্য সমাজে এরূপ অশ্লীল প্রথা প্রচলিত নাই। আবার এদেশে অন্তঃপুর আছে বটে, কিন্তু নারীর নিজস্ব কোন ঘর থাকে না বলিলেই হয়। পরিবারস্থ পুরুষগণের, অন্ততঃ কনিষ্ঠগণের অবাধ যাতায়াত নাই এমন গৃহ বাটীতে একটীও থাকে না।

ইংলণ্ডে স্ত্রী ও পুরুষের পার্থক্য এদেশের মত কথায় কথায় উল্লিখিত হয় না। তাহার কারণ, ইংলণ্ডে পুং-স্ত্রী ভেদ এদেশের মত এত বেশী নহে। এই অস্বাভাবিক পার্থক্যজ্ঞান অল্প বয়স হইতেই এদেশের বালক-বালিকার জীবনে কুফল উৎপন্ন করে। (সংকলিত)

বাসবদত্তা।

(১)

পূর্ব্বকালে মথুরা নগরে বাসবদত্তা নাম্নী এক বারাঙ্গনা বাস করিত। তাহার অনুপম সৌন্দর্য্যের মোহে ডুবিয়া মথুরার অনেক ধনী যুবক আত্মবিনাশ করিয়াছিল। বাসবদত্তা হঠাৎ একদিন বুদ্ধের শিষ্য সন্ন্যাসী উপগুপ্তকে দেখিয়া মুগ্ধ হয়। উপগুপ্ত ব্রহ্মচারী। তাঁহার সুদীর্ঘ দেহ, স্নিগ্ধ মুখমণ্ডল ও প্রশান্ত ললাটে ব্রহ্মচর্য্যের পবিত্র দীপ্তি স্ফুরিত হইতেছিল। প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী বারাঙ্গনা তাঁহাকে নিজ গৃহে আহ্বান করিলে সেই জিতেন্দ্রিয় সন্ন্যাসী প্রশান্ত ভাবে বলিয়া পাঠাইলেনঃ—"উপগুপ্তের পক্ষে বাসবদত্তার গৃহে গমনের সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই।"

বাসবদত্তার যে রূপ-বহ্নিতে মথুরার ক্রোড়পতিগণ ভস্মীভূত হইতে প্রস্তুত—সামান্য একজন ভিখারী সেই অনুপম সৌন্দর্য্যকে প্রত্যাখ্যান করিল!! বাসবদত্তা আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া ভাবিল যে, সন্ন্যাসী হয়তঃ অর্থাভাববশতঃ তাহার নিকট আসিতে সাহসী হয় নাই, পুনরায় বলিয়া পাঠান হইল, "বাসবদত্তা স্বর্ণমুদ্রা চায় না, সন্ন্যাসীর ভালবাসা চায়।" সন্ন্যাসী পূর্ব্বেরই ন্যায় ধীর ভাবে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলেন।

(২)

কয়েক মাস অতিবাহিত হইল। বাসবদত্তা ইতিমধ্যে মথুরার একজন নাগরিকের সঙ্গে প্রেমের কপট অভিনয় করিতেছিল। এমন সময় শুনিতে পাইল যে, ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ বণিক মথুরায় আগমন করিয়াছেন। ধন-লোভে পাপীয়সী নবাগত বণিককে হস্তগত করিতে চেষ্টা করিল। নূতন প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী নাগরিককে হত্যা করিয়া তাহার মৃতদেহ গোময়স্তূপের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল।

নাগরিকের আত্মীয়গণ পুলিসের সাহায্যে স্তূপ হইতে তাহার মৃতদেহ বাহির করিল। রাজার বিচারে বাসবদত্তার হস্তপদ ও নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া তাহাকে শ্মশানের নিকট ফেলিয়া রাখিতে আদেশ হইল।

(৩)

শ্মশানের নিকট বাসবদত্তা পড়িয়া রহিয়াছে। হস্ত পদ ও নাসা কর্ণের ক্ষত হইতে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠিতেছে। গাত্রবস্ত্র লোহিতাকার ধারণ করিয়াছে। ঝাঁকে ঝাঁকে কাক আসিয়া তাহার ক্ষত স্থান ঠুকরাইতে চেষ্টা করিতেছে। একজন করুণহৃদয়া দাসী নিকটে বসিয়া কাকগুলি তাড়াইতেছে। এমন সময় সৌম্যমূর্ত্তি সন্ন্যাসী উপগুপ্ত তথায় উপস্থিত হইলেন।

(৪)

সন্ন্যাসীকে দেখিয়া হতভাগিনী নারী বস্ত্র দ্বারা ক্ষত স্থান আবৃত করিতে দাসীকে অনুরোধ করিল। উপগুপ্ত সকরুণ স্বরে আহ্বান করিলে বাসবদত্তা ক্রোধ ও দুঃখের সহিত উত্তর করিল ঃ—"একদিন এই দেহ পদ্মের ন্যায় রূপপ্রভাদ্বারা চারিদিক বিমোহিত করিয়াছিল এবং আমি তোমার ভালবাসায় মত্ত হইয়াছিলাম! তখন এই দেহ মণিমুক্তা ও সুচিকণ মস্‌লিনে আবৃত থাকিত। আততায়ীর আঘাতে এখন ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, শোণিত ও ময়লা মস্‌লিন ও মুক্তার স্থান অধিকার করিয়াছে! তুমি এখন আসিয়াছ কেন?"

ব্রহ্মচারী উত্তর করিলেন, "ভগ্নি, ভোগের জন্য তোমার নিকট আসি নাই। দেহের লাবণ্য তুমি হারাইয়াছ, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য দান করিতে আমি তোমার নিকট আসিয়াছি।

"তুমি যখন চতুর্দ্দিকে প্রলোভনের দ্বারা বেষ্টিত ছিলে সংসারের ক্ষণিক ভোগস্পৃহা তোমার হৃদয়ে বলবতী ছিল, আমার ধর্ম্মের উপদেশ তখন ত তোমার হৃদয়ে স্থান লাভ করিতে পারিত না, তাই তখন আসি নাই। ক্ষণস্থায়ী রূপের গর্ব্বেই তখন তুমি মজিয়াছিলে; জগৎত্রাতা মহাত্মা 'তথাগতের' (বুদ্ধের) পবিত্র উপদেশ-বাণীতে তখন তুমি কর্ণপাত করিতে না, তাই তখন আসি নাই।

"হায়! অস্থায়ী বাহ্যিক সৌন্দর্য্য ও ভোগের কি শোচনীয় পরিণাম!! সুগঠিত দেহের অসামান্য রূপরাশি বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় দ্রুতবেগে তোমাকে ধ্বংশের পথে লইয়া গিয়াছে। কিন্তু বাসবদত্তা, আর এক সৌন্দর্য্য আছে, যাহার ধ্বংশ ও বিনাশ নাই। প্রভু বুদ্ধের অমৃতময় উপদেশ শ্রবণ করিলে হৃদয়ে এমন পবিত্র শান্তি ও সৌন্দর্য্য পাইবে, যে জগতের পাপপূর্ণ ইন্দ্রিয় সম্ভোগ তাহার কণিকাও প্রদান করিতে পারে না।"

উপগুপ্তের মধুর উপদেশ শ্রবণ করিয়া বাসবদত্তার হৃদয় শান্ত হইল। আধ্যাত্মিক আনন্দের আভাসে তাহার শারীরিক যাতনা প্রশমিত হইল।

জগতের এক দিকে যেমন দুঃখ যাতনা রহিয়াছে, অন্যদিকে তদপেক্ষা মহান্ শান্তি রহিয়াছে।

বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বাসবদত্তা প্রশান্ত চিত্তে মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইল।*

শ্রীকালীমোহন ঘোষ।

*Paul Carus প্রণীত Gospel of Buddha হইতে অনুবাদিত।

জাপান-মহিলার সামাজিক অবস্থা।

শ্রীযুক্ত ইনাজো নিতোবে এম, এ; পি, এচ, ডি সংকলিত "বুসিদো" অথবা "জাপানের প্রাণ" অতি সুন্দর পুস্তক। কি গুণে জাপান এত বড় হইতে পারিয়াছে, কোন্ আদর্শের অনুসরণ করিয়া জাপানীগণ চরিত্রের বর্ত্তমান দৃঢ়তা লাভ করিয়াছে, "বুসিদো"-তত্ত্ব অবগত না হইলে তাহা ভাল বুঝিতে পারা যায় না। এই প্রসিদ্ধ জাপান পণ্ডিত প্রাচীন জাপানে নারীর শিক্ষা ও সামাজিক সম্মান সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন আমরা নিম্নে তাহার মর্ম্ম সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

"জাপানের নারীপ্রকৃতি একটী দুর্বোধ্য সমস্যা বিশেষ। পুরুষ তাহার স্থূল বুদ্ধিতে সহজে এই নারীপ্রকৃতি আয়ত্ব করিতে পারে না। (জাপানের শিক্ষাগুরু) চাইনিজগণের মতে "শিশু" ও "নারী" দুই-ই 'অবোধ্য' ও 'রহস্যপূর্ণ'।

জাপানের নারী-চরিত্রে দুইটী পরস্পর-বিরোধী ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে নারীজনোচিত কোমলতা এবং পুরুষোচিত সামরিক ভাব দুই-ই রহিয়াছে। চাইনিজগণের আদর্শ-পত্নী চিত্রশিল্পে সম্মার্জ্জনী হস্তে অঙ্কিত হইয়া থাকে। অবশ্যই এই সম্মার্জ্জনী স্বামীর বিরুদ্ধে চালিত হইবার জন্য নহে; ইহা কোনরূপ যাদু-চিহ্নও নহে! ইংরেজী পত্নী (ওয়াইফ wife) শব্দ যেমন বস্ত্র-বয়ন-কারিণী (weaver) এই কথা হইতে উৎপন্ন, সংস্কৃত দুহিতা (কন্যা, গাভীদোহনকারিণী) শব্দ যেমন দোহ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন, চাইনিজ পত্নী-বোধক শব্দও তেমনি 'গৃহপরিষ্কার-কারিণী' অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জাপানী নারীর আদর্শও তেমনি গার্হস্থ্যভাব প্রধান। গার্হস্থ্য ও সামরিক এই দুই বিরোধী ভাব জাপানী নারী-জীবনে কিরূপে মিলিত হইল তাহা বোঝা কিছুই কঠিন নহে।

"বুসিদো"-নীতি বীরত্বপ্রধান, বুসিদো-নীতির উপাসকগণ বীরত্বের উপাসক। সুতরাং ভীরুতাপ্রধান নারী-চরিত্রেও জাপানীগণ বীরত্ব-ভাব দেখিলেই সুখী হইত। নারীর স্বাভাবিক কোমলতা তাহাদের নিকট আদৃত হইত না। উইঙ্কেলম্যান (Winckelman) বলেন, গ্রীকদিগের শিল্পে সৌন্দর্য্যের আদর্শ পুরুষভাব-প্রধান, নারী-ভাব প্রধান নহে। লেকি (Lecky) বলেন, এই আদর্শ গ্রীকদিগের নৈতিক জীবনেও পরিস্ফুট

হইয়াছিল। গ্রীক আদর্শের ন্যায় বুসিদো-নীতিও সেই সকল নারীকেই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত, যাহারা নারীর স্বাভাবিক কোমলতা পরিত্যাগ করিয়া পুরুষোচিত শক্তি ও সাহস প্রদর্শন করিতে পারিত। সুতরাং অল্প বয়স হইতেই বালিকাগণ তাহাদের মনের ভাব সংযত করিতে, মাংসপেশিগুলি দৃঢ় করিতে, ও অস্ত্র চালনা করিতে শিক্ষা লাভ করিত। আত্মরক্ষার জন্য 'নাগিনাতা' নামক এক প্রকার তরবারি চালনা করিতে তাহারা শৈশবেই শিক্ষিত হইত। কিন্তু যুদ্ধ করা এই অস্ত্র চালনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না। পুরুষগণকে যেমন দলপতির সেবা করিতে হইত, প্রাণ দিয়াও প্রভুকে রক্ষা করিতে হইত, নারীকে সেরূপ করিতে হইত না। নিজে অস্ত্র চালনা করিয়া নারী আত্মরক্ষা, সতীত্ব রক্ষা করিতেন। তা ছাড়া তাঁহার অস্ত্রশিক্ষার আর এক উদ্দেশ্য ছিল, সন্তানগণকে অস্ত্র শিক্ষা দান।

নারীর পক্ষে তরবারি চালনা শরীরের পক্ষেও হিতকারী, কিন্তু শুধু স্বাস্থ্যোন্নতির উদ্দেশ্যে জাপানী নারীগণ অস্ত্র চালনা শিখিতেন না। প্রয়োজন হইলেই তাঁহারা অস্ত্র প্রয়োগ করিতেন বালিকাগণ যৌবনে পদার্পণ করিলেই "কেইকেন" নামক ক্ষুদ্র পকেট-তরবারী উপহার পাইত। আততায়ীর বক্ষে এবং প্রয়োজন হইলে নিজের বক্ষেই তাহা প্রোথিত হইত। অধিকাংশ স্থলে কেইকেন নারীবক্ষেই ব্যবহৃত হইত। জাপানী মহিলা যখন দেখিতেন, তাঁহার সতীত্বের উপর আক্রমণ হইবার সম্ভাবনা, তখন তিনি পিতা বা স্বামীর তরবারির সাহায্যের অপেক্ষা করিতেন না, তাঁহার নিজ তরবারি সর্ব্বদাই তাঁহার বক্ষে লম্বমান থাকিত। আত্মবিনাশের প্রকৃষ্ট প্রণালী না জানা জাপানী মহিলার পক্ষে নিতান্ত লজ্জার কথা ছিল। দৃষ্টান্ত স্থলে বলা যাইতে পারে, যদিও নারীগণ শরীরতত্ত্ব বিদ্যায় (anatomy) শিক্ষা লাভ করিতেন না, কিন্তু গলার কোন্ স্থানে কাটিলে আত্মহত্যা সহজে হয় তাহা তাঁহাদিগকে শিক্ষা করিতে হইত; কি প্রকারে পদদ্বয় বন্ধন করিয়া আত্মহত্যা করিতে হয়, তাহাও শিখিতে হইত, কারণ তাহা হইলে মৃত্যুযন্ত্রণা যতই কষ্টদায়ক হউক না কেন, তাঁহার মৃতদেহ কখনও শ্লীলতাবর্জ্জিত ভাবে ভূপতিত হইতে পারিত না।

কিন্তু আমাদের নারীগণের মধ্যে বীরত্ব-ভাবের প্রাবল্য থাকিলেও তাঁহারা কোমল গুণাবলীতে বঞ্চিত ছিলেন না। গীতবাদ্য ও নৃত্যকলায় তাঁহারা সুদক্ষ ছিলেন। জাপানী-সাহিত্য নারীরচনায় পূর্ণ। চালচলন সুন্দর করিবার জন্য নৃত্য শিক্ষা দেওয়া হইত। পিতা ও স্বামীর ক্লান্তি দূর করিয়া তাঁহাদের চিত্তবিনোদন করিবার জন্য তাঁহারা গীতবাদ্য শিক্ষা করিতেন। এই সকল কলাবিদ্যা মানসিক পবিত্রতা বৃদ্ধির জন্যই তাঁহারা শিখিতেন, শিল্পকলায় পাণ্ডিত্য লাভ ইহার উদ্দেশ্য ছিল না। লণ্ডনের এক বল নাচে উপস্থিত হইয়া এক পারস্যরাজকুমার নৃত্য করিতে অনুরুদ্ধ হইলে উত্তর করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দেশে এক শ্রেণীর নর্ত্তকী আছে, তাহারাই শুধু এরূপে নৃত্য করে। এই উক্তির সহিত জাপানীদিগের আন্তরিক সহানুভূতি আছে।

আমাদের নারীগণ যে শিল্পকলায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন, প্রদর্শন অথবা সামাজিক প্রশংসা তাহার উদ্দেশ্য ছিল না। পারিবারিক নির্ম্মল আনন্দ বৃদ্ধিই তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল। দশজনের নিকট এ সকল গুণপনা কখন কখন প্রদর্শন করিবার আবশ্যক হইত বটে, কিন্তু তাহা অভ্যাগতদিগকে বিমল আনন্দ দিবার একটা উপায় মাত্র ছিল। প্রাচীন জাপানে নারীগণের সকল প্রকার শিক্ষার মূল কেন্দ্র ছিল পরিবার। পরিবারের সম্মান ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য তাঁহারা দাসীর ন্যায় শ্রম করিতেন, আবশ্যক হইলে জীবন বিসর্জ্জন করিতেন। কন্যারূপে পিতার জন্য, পত্নী-রূপে পতির জন্য, মাতা রূপে পুত্রের জন্য, তাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিতেন। শৈশব হইতেই তাঁহারা আত্মত্যাগে অভ্যস্ত হইতেন। প্রাচীন জাপানে নারীর জীবন অবিরাম আত্মোৎসর্গের জীবন ছিল। কেহ কেহ বলেন, আমরা নারীদিগকে দাসী করিয়া রাখিয়াছি। দাসত্ব শব্দ যদি 'আপন ইচ্ছার বলিদান' অর্থে ব্যবহৃত হয়, তবে এই দাসত্ব অতি সম্মানের সামগ্রী।

দেশ ও প্রভুর জন্য জাপানী পুরুষের আত্মোৎসর্গ যেরূপ স্বেচ্ছাকৃত, গৃহ পরিবারের জন্য জাপানী নারীর আত্মোৎসর্গও তেমনি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত। যে আত্মত্যাগ ব্যতীত জীবনের কোন কঠিন সমস্যারই মীমাংসা হয় না, সেই আত্মত্যাগের উপর যেমন জাপানী পুরুষের দেশ-ভক্তি ও রাজভক্তি প্রতিষ্ঠিত, সেই আত্মত্যাগেরই উপর জাপানী মহিলাদিগের গার্হস্থ্য জীবনও প্রতিষ্ঠিত। জাপানের নারী যে অর্থে পুরুষের দাসী ছিলেন, জাপানের পুরুষ সেই অর্থে তাহার প্রভু বা দলপতির দাস ছিল। স্বাধীন ইচ্ছার বলিদানের অযথা প্রশংসা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। হিগেল (Hegel) বলিয়াছেন, স্বাধীনতার বিকাশই মানবজাতির ইতিহাস। আমি একথার সত্যতা স্বীকার করি। আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে, বুসিদো-নীতির প্রধান কথা, শুধু নারীর নহে— পুরুষেরও আত্মোৎসর্গ।

এক জন নারীহিতৈষী আমেরিকান জাপানী নারী-সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "কবে জাপানের নারীগণ জাপানের প্রাচীন প্রথাসমূহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিবেন!" যতদিন জাপানে বুসিদো-নীতির প্রভাব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত না হয়, তত দিন জাপানীগণ এরূপ উক্তির সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারিবে না। এরূপ বিদ্রোহ কি সফল হইতে পারে? ইহাতে কি নারীদিগের অবস্থা উন্নত হইবে? এই উপায়ে নারীগণ যে অধিকার লাভ করিবেন, তাহা কি তাঁহাদের প্রকৃতির বর্ত্তমান মধুরতা ও কোমলতার তুল্য হইবে? এগুলি অতি গুরুতর প্রশ্ন। পরিবর্ত্তন নিশ্চয়ই আসিবে, কিন্তু বিদ্রোহ হইবে না। আমরা এখন আলোচনা করিয়া দেখি, বুসিদো-নীতির প্রাধান্য সময়ে নারীজাতির অবস্থা এমন ছিল কি না, যাহাতে এখন তাহাদের বিদ্রোহ সমর্থন করা যাইতে পারে।

ইউরোপে ফিউডেল-প্রথার (Feudal system) প্রাধান্য সময়ে নারীর প্রতি (Knights) নাইটদিগের বাহ্যিক সম্মান-প্রদর্শনের ফলাফল ঐতিহাসিকগণের গভীর আলোচনার বিষয় হইয়া রহিয়াছে। হালাম (Hallam) বলেন, এই সম্মান-প্রদর্শন (Chivalry) পবিত্র ভাবমূলক নহে। গুইজো (Guizot) বলেন, ইহাতে সমাজের উপকার হইয়াছে। স্পেন্সার বলেন, সামরিক-ভাবপ্রধান অবস্থায় সমাজে নারীর অবস্থা স্বভাবতঃই হীন থাকে, শিল্প বাণিজ্য ও কৃষির শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নারীর অবস্থা উন্নত হয়।

জাপানে নারীজাতির অবস্থা দেখিলেও বুঝিতে পারা যায়, যুদ্ধব্যবসায়ী সামুরাইদিগের রমণীগণই সর্ব্বাপেক্ষা কম স্বাধীনতা ভোগ করিতেন। উচ্চ শ্রেণী ও শিল্পকর-দিগের সমাজে স্বামী স্ত্রী প্রায় সমান স্বাধীনতাই ভোগ করিতেন।

বুসিদো-নীতির প্রাধান্য সময়ে জাপানের নারীগণ পুরুষের সমকক্ষ ছিলেন না সত্য, কিন্তু তাঁহাদের অবস্থা নিতান্ত মন্দও ছিল না। নানাপ্রকার অসাম্যের মধ্যে পার্থক্য আছে, সেই পার্থক্য ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিলে এ বিষয়ে ধারণা পরিষ্কার হইতে পারে না।

পুরুষে পুরুষে কি পার্থক্য নাই? ভোট দিবার সময় সকল পুরুষেরই ভোটের মূল্য সমান হইতে পারে, কিন্তু ভোট দানে সমান অধিকারী দুই জন পুরুষের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ থাকিতে পারে। আইনের চক্ষে সকল মানুষই সমান হইতে পারে, কিন্তু প্রত্যেকের একটা অন্তর্নিহিত স্বতন্ত্র মূল্য আছে। পৃথিবীতে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই কতকগুলি বিশেষ কার্য্য আছে; সেই সকল বিশেষ বিশেষ কার্য্যকে এক তুলাদণ্ডে ওজন করা চলে না। বুসিদো-নীতি যুদ্ধক্ষেত্র এবং রন্ধনশালা উভয়ত্রই নারীর শক্তি বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছে, এবং দেখিয়াছে, যুদ্ধক্ষেত্রে নারীর স্থান নাই বলিলেই চলে, কিন্তু রন্ধনশালায় নারীই সর্ব্বেসর্ব্বা। সুতরাং রাজনৈতিক জগতে নারী অধিক সম্মান লাভ করেন নাই, কিন্তু পত্নী ও মাতা রূপে তিনি অতি উচ্চ সম্মান ও গভীর ভালবাসার অধিকারী হইয়াছিলেন। রোমানগণ যোদ্ধৃজাতি ছিল, তাহাদের মধ্যে নারীগণ এত সম্মান পাইতেন কেন? যোদ্ধা অথবা ব্যবস্থা-প্রণেতারূপে কি নারীগণ সম্মান পাইতেন?—না। তাঁহারা জননীজাতি বলিয়াই গভীর সম্মানের অধিকারিণী ছিলেন। আমাদের

সমাজেও তাহাই ছিল। পিতা অথবা স্বামী যুদ্ধে গেলে গৃহের সকল ভারই নারীর হস্তে পড়িত। সন্তানদিগের শিক্ষা দান, তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ নারীগণই করিতেন। নারীদিগের যে অস্ত্রচালনা শিক্ষা, তাহার এক প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, শিশুদিগকে শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ততা লাভ করা।

আমরা আমাদের পত্নীগণকে 'চাষা স্ত্রী (rustic wife) বলিয়া থাকি; এজন্য বিদেশীগণ মনে করেন, আমরা পত্নীগণকে নিতান্ত হেয় চক্ষে দেখি। কিন্তু এই ধারণা নিতান্ত ভ্রমাত্মক। আমাদের বিবাহ-বন্ধন ও দাম্পত্য মিলন খ্রীষ্টান বিবাহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ব্যক্তিত্ব-প্রধান এংলোস্যাক্‌সন জাতি (Anglo Saxon) স্বামী-স্ত্রীকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি মনে না করিয়া পারে না। যখন স্বামীস্ত্রীর মধ্যে খুব মিল থাকে তখন পরস্পরের আদর আর ধরে না। যখন মনোবাদ হয়, তখন তাহাদের স্বতন্ত্র অধিকার। স্বামী অথবা স্ত্রী তৃতীয় ব্যক্তির নিকট পরস্পরের গুণ বা দোষ কীর্ত্তন করিলে আমাদের নিকট তাহা নিতান্তই বিসদৃশ বোধ হয়। স্বামী স্ত্রী ত এক! তবে আবার নিজের প্রশংসা বা দোষ অপরের নিকট কীর্ত্তন করিবে কি? আমাদের সামুরাইগণ পত্নীকে একটু নিন্দা করাই ভদ্রতার পরিচায়ক মনে করিতেন।"

অধ্যাপক নিতোবে-লিখিত বিবরণ পাঠ করিলে স্পষ্টই দেখা যায়, প্রাচীন কালে ভারতের হিন্দু নারী অপেক্ষা জাপান-নারীর অবস্থা উন্নত ছিল না। বরং কোন কোন বিষয়ে ভারত-নারীর অবস্থা জাপান-নারীর অবস্থা অপেক্ষা অনেক ভাল ছিল। কারণ, ভারতের প্রাচীন সভ্যতা জাপানী প্রাচীন সভ্যতা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। ইউরোপে মধ্য যুগে নারীগণ যে সম্মান লাভ করিতেন—সেই গ্যালাণ্ট্রি (gallantry) বা সিভাল্‌রি (Chivalry) যে বিশেষ উন্নত পদার্থ ছিল, তাহাও মনে হয় না। ভারত-নারী প্রাচীন কালে যে সম্মান ভোগ করিতেন তাহা এই গ্যালাণ্ট্রি অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ।

কিন্তু অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমানের তুলনা করিলে কি মনে হয়? প্রাচীন কালে ভারতের হিন্দুনারীর অবস্থা জগতের অন্য সকল দেশের নারীগণের অবস্থা অপেক্ষা ভাল ছিল, কিন্তু এখন যদি তাঁহাদের অবস্থা আর সকলের অবস্থা অপেক্ষা হীন হয়, তবে শুধু অতীতের দোহাই দিয়া কি হইবে? জাপান-নারী জাগিয়া উঠিয়াছে। জাপানে এখন শতকরা ৮০ জনের অধিক স্ত্রীলোক লেখা পড়া শিখিয়াছে। শিক্ষা মানুষের অন্তরস্থ দৈব শক্তিকে জাগ্রত করিয়া দেয়। অগ্নিকে যেমন কেহ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখিতে পারে না, শিক্ষা প্রাণে যে আকাঙ্ক্ষা ও উন্নতিস্পৃহাকে জাগ্রত করিয়া দেয়, কোনও সামাজিক রীতি, কোন শাস্ত্রীয় কুবিধি তাহাকে বাধা দিতে পারে না। অধ্যাপক নিতোবে বলিয়াছেন, জাপানে নারীগণ প্রাচীন প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে না। পুরুষগণ বুদ্ধিমান হইলে নারীর বিদ্রোহ-ঘোষণার প্রয়োজন কি? অন্যান্য দেশে ঘোর রক্তারক্তির পর নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু জাপান ও তুরস্কের সম্রাট বুদ্ধিমান ছিলেন বলিয়া এই দুই দেশে বিনা রক্তপাতে নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে প্রকার অবস্থা দেখা যাইতেছে, তাহাতে আশা করা যায়, জাপান ও তুরস্কের নারীগণও বিনাবিদ্রোহেই সমাজে আপন অধিকার লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। কেবল ভারত-নারীই কি জাগিবে না? যে সকল ভারত-নারী শিক্ষার আলোক লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা দেশে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগুন। তাঁহারা প্রত্যেকে সংকল্প করুন, তাঁহাদের অন্ততঃ ২।৪ জন অশিক্ষিতা প্রতিবাসিনীকে নিজেরা বিদ্যাশিক্ষা দিবেন। দেখিবেন, তাঁহাদের কার্য্যের অনুপাতে নহে, শ্রমের অনুপাতে নহে, কিন্তু প্রাণের সদাকাঙ্ক্ষার অনুপাতে স্ত্রীশিক্ষা এ দেশে বৃদ্ধি পাইবে, নারীজাতির অবস্থা উন্নত হইবে, সকল বাধা দূরে পলায়ন করিবে, দেশ জাগিবে।

কিশা গোতমী।

একদিন বুদ্ধদেব সপার্ষদ বসি'
জগতের দুঃখ দৈন্য-জরা-মৃত্যু-মসী

কেমনে হইতে পারে সহজে স্খালন
তাহারি শাস্ত্রতোপায় করেন বর্ণন
অমৃত-মধুর ভাষে; মুগ্ধ আত্মহারা
সুবিপুল জনসঙ্ঘ নব জ্ঞান-ধারা
আনন্দে করিয়া পান; বুঝি অলক্ষিতে
দেবগণও স্তব্ধ হয়ে ছিলা চারিভিতে
নির্ব্বাণের মহাবাণী উৎসুক হৃদয়ে
করিতে শ্রবণ আহা!
এমন সময়ে,
নভোভেদী-আর্ত্তনাদ জাগিল অদূরে
ব্যাকুল চঞ্চল করি সকরুণ সুরে
সবাকারে অকস্মাৎ! সহস্র নয়ন
নিরখিল নারী এক করে আগমন
অতি দ্রুত, ঝড় যথা বৈশাখী-সন্ধ্যায়,—
উন্মাদিনী, ভূমিতলে অঞ্চল লুটায়
বিচূর্ণ আশার সম, কুঞ্চিত কুন্তল
আলুথালু, শূন্যে উড়ে কৃষ্ণ মেঘদল
যেন নব বর্ষাগমে! মৃত পুত্রক্রোড়ে;
ক্ষণে ক্ষণে বাঁধি তায় দুটী ভুজডোরে
চাপে বক্ষে, মাতৃ-স্নেহ যেন হৃদি চিরি
মুহূর্ত্তে নিষ্ঠুর ভবে বারেক বাহিরি'
নবীন পরাণ চাহে করিবারে দান
প্রাণাধিক প্রিয় সুতে; সুন্দর অম্লান
রৌদ্র-দগ্ধ পুষ্প-কলি যবে পড়ে ঝরি'
জননী ধরিত্রী দেবী পুনঃ বৃন্তোপরি
করে বৃথা স্থাপিতে প্রয়াস।
ত্রস্তে সবে
সরে গেল; মুক্ত-পথে আপন গৌরবে
গেল অগ্রে ক্ষিপ্র পদে দুর্ভাগিনী নারী
বুদ্ধ পাশে; সম-দুঃখে মুছি আঁখি-বারি
চিনিল অনেকে সেই সন্তান বৎসলা
কিশা গোতমীরে হায়! আজিকে চঞ্চল
গাম্ভীর্য্যের প্রতিরূপা সুশীলা কামিনী
মহাশোকে, শরতের স্থিরা তরঙ্গিনী
ব্যাত্যা-ক্ষুব্ধা সুভীষণা!
প্রণমি গোতমে
গোতমী কহিল কেঁদে—"যদি ভাগ্যক্রমে
পেয়েছি দর্শন তব ওগো ভগবান্,
কর তবে কৃপাময়, মোরে পরিত্রাণ
এ তীব্র যাতনা হতে! শুনিয়াছি আমি
বিশ্বের মুক্তির বার্ত্তা বহিবারে তুমি,
ভবে আসিয়াছ শুধু; মৃত সুতে মোর
ভেঙ্গে দিয়ে আজিকার কাল-সুপ্তি-ঘোর
দাও মোরে মুক্তি প্রভো!
করুণা-নির্ঝর,
সমর্পিনু এই তব শ্রীপদ উপর
প্রাণ-মণি বৎসে মম!"
এতেক কহিয়া
অশ্রুসনে সুনির্ভরে শোকাতুর হিয়া
বুদ্ধের চরণে শিশু করিল রক্ষণ
ভক্তের অঞ্জলি হেন!
বিস্ময়ে মগন
সুমহান্ জনার্ণব; সিদ্ধার্থ গম্ভীর
প্রসন্ন দয়ার্দ্র আঁখি, বিশ্ব-জগতীর
হরি গ্লানি কহিলেন (দৈববাণী যেন
উদ্ভাসিল নভোপথে!) "বৃথা দুঃখ কেন,
শান্ত হও হে রমণি! জরা-মৃত্যু শোক
জগতের ধর্ম্ম এই, নিত্য মর লোক
সহে তা'রি দারুণ সন্তাপ, দুনির্ব্বার
মায়ামোহ বশে! একমাত্র আছে তার
মুক্তির উপায় বৎসে! কেহ কারো নয়,
সংসার প্রপঞ্চ শুধু'—সমগ্র হৃদয়
এ বিশ্বাসে পূর্ণ করি মুমুক্ষু পরাণে
কর্ত্তব্য-পালন-ব্রতে সাফল্য-সন্ধানে
নির্ব্বাণের পথ হবে করিতে আশ্রয়
হে কল্যাণি! চাই সেথা শুধু আত্ম-জয়;
দুস্তর সাধনা সে যে!
যাও গৃহে ফিরে
সন্তানের প্রতি তব অয়ি লো অধীরে,
অন্তিম-কর্ত্তব্য শুধু করিতে পালন

সুমঙ্গল পুণ্য কৃত্যে !"
তরঙ্গ ভীষণ—
কে রোধিতে পারে দু'টী বাহু প্রসারিয়া
অকস্মাৎ ? উন্মাদিনী উঠিল গর্জ্জিয়া
ক্ষোভে রোষে—"বুঝিলাম চাতুরী তোমার,
তুমি নহ মুক্তিদাতা ! বাক্যে চমৎকার
বৃথা মুগ্ধ কর সবে ! কোথা সে নির্ব্বাণ,
মিথ্যা-প্রতারণা তব ! কোন্ ক্ষুদ্র প্রাণ
নিষ্ফলে ভুলিবে তায় ? তুমি মাতা নহ—
নাহি জান কি অপূর্ব্ব জননীর স্নেহ,
পুত্রহারা মায়ে তাই সান্ত্বনার ছলে
করিতেছ পরিহাস ! ধন্যা ভূমণ্ডলে
ভাগ্যবতী মায়াদেবী, দহে নাহি তাই
জীবন্তে মৃতের প্রায় তোমারে হারাই'
গৃহাশ্রমে হে নির্ম্মম ! তুমি রহ তব
নির্ব্বাণের ব্যাখ্যা লয়ে ! অন্ধকার ভব ;
নাহি আর স্থান মোর ! উদ্বন্ধনে ত্যজি'
শোক-দীর্ণ তুচ্ছ প্রাণ, পাব শান্তি আজি
পুত্র পথ অনুসরি' !"
থামি ক্ষণকাল
দীপ্ত চক্ষে চারি ধারে নিরখি ভয়াল
ত্রস্তকরে মৃত সুতে নিল আরবার
তুলি বক্ষে, কহে পুনঃ করি হাহাকার
ঊর্দ্ধে চাহি—"হে দেবতা, তুমিও নির্দ্দয়
নির্ম্মম নরের সম ! এ দগ্ধ হৃদয়
শূন্য করি, হরি হায়, বাছনিরে মোর
কি শুভ উদ্দেশ্য দস্যু, সাধিলিরে তোর
নাহি বুঝি ! নিষ্কলঙ্ক নিষ্পাপ শিশুর
ক্ষুদ্র প্রাণে প্রয়োজন যদি হে নিষ্ঠুর,
এত তোর, কর তবে মোরেও গ্রহণ
ধর্ম্মরাজ !
দাঁড়াও, দাঁড়াও প্রাণ-ধন,
মায়ে হায়, একা ফেলি যেতেছ কোথায়
আসি আমি !"
এত কহি ছুটিবারে চায়
কক্ষ-চ্যুত উল্কা সম সে কিশা গোতমী
মৃত্যুর করাল দ্বারে ! মর্ম্মোচ্ছ্বাস দমি,
স্থির তবু জনসঙ্ঘ !
ক'ন শাক্যমুনি
পুনর্ব্বার—"নিভাইব তব শোকাগুনি
স্থির হও, মৃত সুতে দিব প্রাণদান
হে ললনে ! বাক্য মোর কর অবধান
গুটিকত শস্য মোরে দাও শুধু আনি
ভিক্ষা করে।"
অকস্মাৎ শুনি আশা-বাণী
স্তম্ভিতা গোতমী, মন্ত্র-মুগ্ধা সর্পী যথি ;—
চাহি রহে বুদ্ধ পানে, ক'ন শুদ্ধমতি
পুনরায়—"যাও বৎসে, পুত্রে রাখি হেথা,
শস্য-মুঠি মাগি আন, ঘুচাইব ব্যথা
নন্দনে জীয়ায়ে তব ; কিন্তু রেখো মনে
সেথা হ'তে আন শস্য, যাহার সদনে
মৃত্যু করে নাই কভু কঠোর পরশ
রুদ্র করে, দুঃখ-হীন নির্ম্মল হরষ
জাগি আছে অনুক্ষণ !"
হায়রে নাচিয়া
উঠিল জননী প্রাণ ! বারেক ভাবিয়া
দেখিল না সুলভ কি দুর্ল্লভ অতুল
কালাতীত নর-গৃহ ! পথ করি ভুল
ছুটিল সে শোকাতুরা শস্যের সন্ধানে
প্রতি গৃহস্থের দ্বারে ; ভিক্ষা দিতে আনে
শস্যপুঞ্জ পুরাঙ্গনা, শুধায় রমণী
ব্যগ্র ভাবে—"কহ অগ্রে আমারে জননী,
তব গৃহে কোন দিন মরেছে কি কেহ—
জেগেছে কি দুঃখের কল্লোল ?" হেন গেহ
কোথা মর্ত্ত্যে ! ভিক্ষাদাত্রী বিস্মিত অন্তরে
ফিরে যায়, শুনাইয়ে আপনি কত রে
সহিয়াছে মর্ম্ম-জ্বালা !
মহা নগরীর
প্রতি গৃহ তন্ন তন্ন খুঁজিয়া অস্থির
কিন্তু বামা, নাহি পায় কোথা হেন ঠাঁই
কালের চরণ-চিহ্ন যেথা পড়ে নাই—

কোন দিন; আসে নাই বিষাদ প্লাবন
ভাসাইয়া জীবনের আনন্দ মোহন
মুহূর্ত্তেকে! বহু যত্নে রচা কুঞ্জবন
ক্ষণে ক্ষণে কালানলে করিয়া দহন
ভস্ম করি দিয়ে গেছে প্রাণাধিক প্রিয়
আত্মীয় স্বজনগণে! নহে রমণীয়
এ সংসার! পিতা-হারা, মাতা-হারা কেহ,
পতি-পুত্র-ভ্রাতৃ-হারা কাঁদে অহরহঃ
কোন জন! চারিধারে বীভৎস ভীষণ
নিশীথ-শ্মশান সম, মোহের বন্ধন—
তবু রাখিয়াছে সবে প্রমত্ত ক্রীড়ায়
অর্ব্বাচীন শিশু হেন!
নির্ম্মল-আশায়
সারা দিনমান ভ্রমি দুয়ারে দুয়ারে
চিন্তিল গোতমী কিশা, নিখিল সংসারে
সে নহে একেলা শুধু পুত্র-শোকাতুরা
অভাগিনী, লক্ষ গুণে বেদনা-বিধুরা
দিশে দিশে মাতিয়াছে মায়ার উৎসবে,
অবিরাম; সে কেন গো শুধু আর্ত্ত রবে
বিসর্জ্জিবে তপোলব্ধ মনুষ্য-জীবন
অকারণে; দেব-দান বুঝি' এ বেদন
লইবে না কেন শিরে তুলি'?—
শান্তি ধীরে
ফিরে আসে, মরুভূমি নব বর্ষা-নীরে
সিক্ত যেন! তমোময় রজনীর শেষে
সু-বর্ণ কনক-আভা প্রাচ্য নভোদেশে
রঞ্জে যবে মন্দগতি, তারকার দল
একে একে মিলায় কোথায়, জলস্থল
জেগে উঠে দিব্য করে; তেমতি সুন্দর
শান্তি সনে আত্মজ্যোতিঃ সকল অন্তর
উদ্ভাসিল গোতমীর, বেদনানিকর
ম্লান হয়ে গেল ধীরে, যেমতি লহর
মিশে যায় সিন্ধু-বক্ষে বারেক উথলি
অকস্মাৎ!
মুছি আঁখি 'ধন্য দেব' বলি
ফিরিল গোতম পাশে আবার গোতমী
ভক্তি-শান্ত-নম্র-মনে, রাঙ্গাপদে নমি
কহিল সম্বোধি তাঁরে "ক্ষম অপরাধ
হে সিদ্ধার্থ! লভি ভাগ্যে তব আশীর্ব্বাদ
জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হয়েছে আমার
আজি নাথ! চিনিয়াছি কেমন সংসার
যন্ত্রণার রঙ্গভূমি! সমগ্র নগরী
ভ্রমি' হায়, পারি নাই আনিতে আহরি'
শস্য-কণা, পাই নাই একটি কোথায়
অ-মৃত গৃহস্থ-গৃহ, শূন্য হাতে হায়,
তাই আসিয়াছি ফিরি'! সারা মর্ত্ত্যলোক
শোক-দগ্ধ, বিশ্ব-শোকে ভুলিয়াছি শোক
আপনার! নাহি চাই আর পুত্র-প্রাণ,—
দাও দীক্ষা লভি যেন অন্তিমে নির্ব্বাণ!"

শ্রীধীরেন্দ্রকুমার দত্ত।

সয়তানের শোক।

শ্রীমতী মেরী করেলী বর্ত্তমান সময়ে ইংরেজ মহিলা-দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম লেখিকা। তাঁহার গভীর চিন্তা-শীলতাপূর্ণ প্রবন্ধ, তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি ও হৃদয়ের উদারতা-ব্যঞ্জক উপন্যাসাবলী ইংরেজ জাতির গৌরবের সামগ্রী। ভারত-মহিলার পাঠক-পাঠিকাদিগকে আমরা অদ্য তাঁহার সয়তানের শোক (Sorrows of Satan) নামক উপন্যাসের উপাখ্যানটী সংকলন করিয়া দিলাম।

ধন সম্পদে যে প্রকৃত সুখ পাওয়া যায় না এবং মানুষ স্বার্থপর ও আত্মসুখরত হইলে অর্থ তাহাকে নরকের পথে কেমন দ্রুতগতিতে অগ্রসর করে, আর ঈশ্বরের করুণা সেই পতন হইতে মানুষকে কিরূপে রক্ষা করে, তাহা প্রদর্শন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

এই গল্পটী বুঝিতে হইলে গ্রন্থোক্ত সয়তানের চরিত্রের কিঞ্চিৎ পরিচয় পূর্ব্বেই দেওয়া আবশ্যক। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে সয়তান স্বর্গভ্রষ্ট দেবদূত; উন্নত অবস্থা

হইতে অধঃপতিত হইয়াছে। এখন সর্ব্বদাই ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে এবং মানুষকে ভগবানের বিরোধী হইতে, নরকের পথে অগ্রসর হইতে দেখিলেই তাহার সুখ এবং কুপথে মানুষকে সাহায্য করাই তাহার কাজ। কিন্তু মেরী করেলী সয়তানের প্রকৃতিকে একটু বিভিন্ন রূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার সয়তান পুনরায় স্বর্গসুখ ভোগ করিবার জন্য, অন্তরে শান্তি পাইবার জন্য ব্যাকুল। মানুষ যতই সয়তানের পরীক্ষা প্রলোভন হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে, সয়তানের মুক্তির পথ ততই পরিষ্কার হয়।

গ্রন্থের নায়ক জিওফ্রে টেম্পেষ্ট একজন সাহিত্যসেবী দরিদ্র লোক। সাহিত্যের সেবা করিয়া তাহাকে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে হয়, জীবিকানির্ব্বাহের আর কোন উপায় নাই। উৎসাহী যুবক সাহিত্য-জগতে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য লালায়িত, কিন্তু আজ কালের দিনে লোকের তরলভাবের পক্ষে তৃপ্তিকর লেখা লিখিতে না পারিলে না পাওয়া যায় সম্মান, না মিলে তাহাতে অর্থ। নিজের আদর্শকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সাধারণ পাঠকের মনের মত, সমালোচকদিগের মনের মত করিতে হইবে, তবে ত পুস্তকের আদর হইবে! নানাস্থানে নিরাশ হইয়া, প্রকাশকদিগের নিকট প্রত্যাখ্যান লাভ করিয়া হতাশ হৃদয়ে যুবক রোজ আপনার ভাড়াটিয়া গৃহে প্রবেশ করে এবং কি করিয়া বাড়ী-ওয়ালির প্রাপ্য শোধ করিবে, ভাবিয়া আকুল হয়। একদিন এই প্রকার নিরাশ হইয়া বাড়ী ফিরিয়া অদৃষ্ট চিন্তা করিতেছে, এমন সময় হঠাৎ এক পুরাতন বন্ধুর কথা মনে হইল, এবং তাহার নিকট সাহায্যের জন্য পত্র লিখিল। সেই সহৃদয় বন্ধু আনন্দের সহিত জিওফ্রেকে সাহায্য করিল। ভাগ্য যখন প্রসন্ন হয় তখন অসম্ভাবিত উপায়ে অর্থ আসে, জিওফ্রেরও তাহাই হইল। তাহার দুরসম্পর্কিত এক ধনী আত্মীয়ের হঠাৎ মৃত্যু হওয়াতে এবং তাহার নিকট-উত্তরাধিকারী না থাকায় জিওফ্রে হঠাৎ লক্ষপতি হইয়া পড়িল। এমন সময়ে আবার লুসিও রোমানেজ নামক একজন অতি বিখ্যাত ক্রোড়পতি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া জিওফ্রের বন্ধুত্ব লাভের জন্য উপস্থিত হইল। এই সম্মানিত, সুশিক্ষিত ধনীর সাহায্যে জিওফ্রে অভিজাত-পদবীতে আরোহণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইল। কারণ, ধন আছে, বিদ্যা আছে তবে সে কেন সমাজের উচ্চস্তরে বিচরণ করিবে না? আর রোমানেজও নিতান্ত ভদ্র, সর্ব্বদাই জিওফ্রেকে আপ্যায়িত করিতে যত্নবান। কিন্তু রোমানেজের মধ্যে জিওফ্রে মাঝে মাঝে কেমন একটা অস্বাভাবিক ভাব অনুভব করে, তাহাকে যেন সময় সময় কেমন একটা সমস্যার মত মনে হয়।

অগাধ ধনের অধিপতি হইয়া জিওফ্রের প্রথম আকাঙ্ক্ষা হইল সাহিত্য-জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করা। অনেকদিন ধরিয়া প্রাণে যে তৃষ্ণা পোষণ করিতেছিল, তাহা পরিতৃপ্ত করাই এখন তাহার প্রধান কাজ হইল। সে তাহার দৈন্যাবস্থায় একখানি পুস্তক লিখিয়াছিল, পাঠক-সমাজে আদৃত হইবে না আশঙ্কায় প্রকাশকগণ তাহা প্রকাশ করিতে সম্মত হয় নাই। রোমানেজ এখন পরামর্শ দিল, নিজের যখন অর্থের অপ্রতুল নাই, তখন প্রকাশকের অর্থসাহায্যের আর প্রয়োজন কি? তাহার পরামর্শে বহু অর্থব্যয়ে পুস্তক মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল। বিখ্যাত সমালোচকদিগকে অনেক ঘুষ দেওয়া হইল। বড় বড় সংবাদপত্রে জিওফ্রের পুস্তকের প্রশংসার ধুম পড়িয়া গেল। একজন প্রতিভাশালী উদীয়মান গ্রন্থকারের একখানি নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া সমালোচকগণ ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। এক সংস্করণের পুস্তকেই কিছুদিন পরে পরে মলাট দিয়া তিন সংস্করণ করা হইল। কিন্তু হায়! জিওফ্রে যাহা চাহিয়াছিল তাহা পাইল না। লোকে লক্ষপতি জিওফ্রে-রূপেই তাহার পরিচয় দিতে লাগিল, সাহিত্যসম্মান তাহার ভাগ্যে জুটিল না। জিওফ্রে ভাবিয়া দেখিল, তাহার দৈন্য দশায় মনের যে উন্নত ভাব পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছিল, এখন আর অন্তরের সহিত তাহার সঙ্গে সহানুভূতি করিতে পারে না। সে দেখিল, দরিদ্র উন্নত-হৃদয় জিওফ্রে এখন ধন লাভ করিয়া মনের উন্নত অবস্থা হারাইয়াছে। মনের যে অবস্থায় পুস্তকখানি লিখিয়াছিল এখন সে চেষ্টা করিয়াও সেই অবস্থা আর ধারণা করিতে পারেনা।

লেখকের জীবন ও লেখার মধ্যে এত পার্থক্য থাকিলে তাহার পুস্তক লোকসমাজে সমাদর লাভ করিতে পারে না। জিওফ্রে নিজেই এখন বিস্মিত হইতে লাগিল যে, এক সময়ে তাহার মনে এমন উচ্চ চিন্তার উদয় হইত! কিন্তু এখন কি পরিবর্ত্তন! দারিদ্র্যের নিদারুণ কশাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া যে ব্যক্তি ধনসম্পদের অধিকারী হয়, সংসারের দুঃখক্লেশ দূর করিবার জন্য আগ্রহ হওয়াই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু জিওফ্রের হৃদয়ে সেই উন্নত চিন্তা আসিয়াও স্থান পাইল না। সে মনে করিতে লাগিল, আমার দুঃখের দিনে একজন মাত্র বন্ধু ব্যতীত কেহ ত আমার মুখের দিকে চাহে নাই! তবে আমি কেন অপরের দুঃখে ব্যথিত হইব? সংসারের দীন দরিদ্র যাহারা, আপন ভাবনা লইয়া তাহারা মরুক গিয়া, তাহাদের প্রতি আমার আবার কর্ত্তব্য কি?

লক্ষপতি জিওফ্রের ধন মানের প্রশংসা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। লুসিও রোমানেজ তাহাকে ধনীসমাজে ধনীদিগের প্রিয় ক্রীড়াসমূহে ও জুয়াখেলার আড্ডায় লইয়া যাইতে লাগিল। তাহাকে লর্ড এলটন নামক একজন অভিজাতের সহিত পরিচিত করিয়া দিল। ইঁহার জমিদারী বন্ধক পড়িয়াছে, সহরের জাঁকজমকটুকুমাত্র অবশিষ্ট আছে। জিওফ্রে তাঁহার জমিদারী ক্রয় করিবার বাসনা করিল। লর্ড এলটন তাঁহার কন্যা লেডি সিবিলের সহিত জিওফ্রে ও রোমানেজকে পরিচিত করিয়া দিলেন। লেডি সিবিল অপূর্ব্ব রূপবতী, গীত বাদ্যাদিতে সুশিক্ষিতা। জিওফ্রে তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল। তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিল। অবশেষে তাহার নিকট বিবাহ প্রস্তাব উপস্থিত করিল। কিন্তু লেডি সিবিলের চিত্ত রোমানেজই আকর্ষণ করিয়াছিল, জিওফ্রে তাহা অধিকার করিতে পারে নাই। রোমানেজের আকৃতি রাজপুত্রের ন্যায়, তাহার আচার ব্যবহার অতি সুমার্জ্জিত, তাহার হৃদয় অতি সুকোমল, তাহার বাক্যবিন্যাস নারী-চিত্তহারী। কিন্তু রোমানেজ লেডি সিবিলের নিকট বড় ঘেঁসিত না। সুতরাং লেডি সিবিল বুঝিতে পারিল, রোমানেজ তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই। ঋণদায়গ্রস্ত লর্ড এলটন জিওফ্রের হস্তে কন্যা সমর্পন করিয়া অস্তগামী সৌভাগ্যকে আরো কিছু দিন রক্ষা করিলেন। ইংলণ্ডে অভিজাত সম্প্রদায়ে এরূপ ঘটনা অনেক ঘটিয়া থাকে। ধনের খাতির, সম্ভ্রমের খাতির দেখিয়া অনেক তরুণীকে বর নির্ব্বাচন করিতে হয়, হৃদয়ের ভালবাসাই সকল সময়ে বর মনোনয়নে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে না। অনেক মূল্য দিয়া জিওফ্রে লেডি সিবিলকে লাভ করিল। হায় জিওফ্রে! আজ যদি তুমি এত অর্থশালী না হইতে, চিরজীবন দরিদ্র থাকিয়া যদি কোন সামান্যা নারীর অকৃত্রিম প্রেমের অধিকারী হইতে, তবে তুমি কি স্বর্গ সুখ ভোগ করিতে পারিতে! বাস্তবিক বিলাতী সমাজে ধনীগণ অকৃত্রিম দাম্পত্য প্রেম ভোগ করিতে পারে কি না, অনেক সময়েই তাহাতে সন্দেহ হয়। নারীর পবিত্র প্রেমরূপ স্বর্গসুখ বুঝি কেবল দরিদ্রগণই প্রচুর পরিমাণে ভোগ করিতে পারে! দুঃখ দরিদ্রতায় যে প্রেম অটল, দারিদ্র্যের পেষণ ও মনস্তাপের মধ্যে যে প্রেম অনাবিল, সন্দেহ ও নিরাশার গভীরতম অন্ধকারে যে প্রেম সাহস, মাধুর্য্য ও আত্মত্যাগে সমুজ্জ্বল, কয়জন ধনবানের ভাগ্যে সে পবিত্র প্রেম আস্বাদন করিবার সুযোগ ঘটে? ক্রোড়পতিগণ সকল সুন্দরী হইতে বাছিয়া এক পরমা সুন্দরীকে পত্নী মনোনীত করিতে পারে, এবং অলঙ্কার ও মণিমুক্তায় তাহাকে জড়িত করিতে পারে, কিন্তু নারীর অন্তরের প্রকৃত ভালবাসা না পাইলে কোনও স্বামীই সুখী হইতে পারে না। হতভাগ্য জিওফ্রেও সুখী হইতে পারিল না।

গ্রন্থকর্ত্রী এই স্থানে মাবিস ক্লেয়ার নাম্নী এক জন লোকপ্রিয়া উপন্যাস-লেখিকাকে ঘটনাস্থলে অবতীর্ণ করিয়াছেন। মাবিস ক্লেয়ার সরলস্বভাবা নারী। সমালোচকদিগের তীব্র আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়াও তাঁহার যশঃ দিন দিন বাড়িতেছে, তাঁহার পুস্তকাবলীর কাটতি দিনের পরে দিন বৃদ্ধিই পাইতেছে। ক্লেয়ারের মস্তিষ্ক শীতল, হৃদয় শান্ত। সমালোচকের কঠোর আক্রমণে তাঁহাকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারে না। জিওফ্রেও তাঁহাকে আক্রমণ করিতে ছাড়ে নাই। সাহিত্যজগতে নিজের নিরাশা এবং মাবিস ক্লেয়ারের যশোবৃদ্ধিই এই

হিংসার কারণ। একজন স্ত্রীলোক সাহিত্য-সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিতেছে, সমালোচকগণের পক্ষে ইহাই যেন অসহ্য বোধ হইতেছিল। কিন্তু জিওফ্রে ক্রমে মাবিস ক্লেয়ারের মহত্ত্বে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল এবং তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়া, তাঁহার প্রকৃতির সরলতা ও অমায়িকতা দেখিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতে লাগিল। ক্রমে জিওফ্রে ও মাবিস ক্লেয়ারের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মিল। জিওফ্রে বুঝিতে পারিল, হিংসাপ্রণোদিত হইয়া এক নির্ম্মল রমণীরত্নের প্রতি সে অতি অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিয়াছে।

লুসিও রোমানেজও মাবিস ক্লেয়ারের সঙ্গে মিশিতে চেষ্টা করিয়াছে। তাঁহাকে সাহায্য করিতে, সুখী করিতে, ব্যাকুল আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু ক্লেয়ার তাহার আগ্রহের প্রতি কিছুমাত্র সম্মান দেখান নাই। সে ক্লেয়ারের হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলিকে উদ্রিক্ত করিয়া সংসারের সুখে তাঁহাকে আসক্ত করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছে; তাঁহার যশঃ ও মানসিক শক্তির সঙ্গে একজন জীবন-সঙ্গীর অনাবিল প্রেমের সংযোগ ঘটিলে তাঁহার জীবন আরো কত মধুময় হইবে, সুললিত ভাষায় তাঁহাকে বুঝাইতে অনেক চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু মাবিস ক্লেয়ারের মন কিছুতেই গলিল না, তিনি তাহার সকল সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিলেন।

ওদিকে লেডি সিবিল ও জিওফ্রের মিলন সুখের হইল না। সিবিল স্পষ্টাক্ষরে জিওফ্রেকে বলিয়াছে, সে তাহাকে এক তিলও ভালবাসে না, শুধু অর্থের জন্যই এই বিবাহ হইয়াছে। কিন্তু জিওফ্রে সিবিলের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ, তাহার কমনীয় গুণরাশিতে অভিভূত। তাহার মনে আশা এই, সিবিলের হৃদয়ের প্রেম এখন না পাইলেও শীঘ্রই সে তাহার চিত্ত অধিকার করিতে পারিবে, কিন্তু তাহার সুখের স্বপ্ন শীঘ্রই ভাঙ্গিল। বিবাহের পর বিদেশে মধুমাস (Honeymoon) যাপন করিয়া সিবিল ও জিওফ্রে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। তখন রোমানেজ কয়েক দিনের জন্য তাহাদের গৃহে অতিথি হইল। সিবিল অতি সমাদরে অতিথির সেবা করিতে লাগিল। একদা গভীর রাত্রে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে জিওফ্রে পত্নীকে বিছানায় দেখিতে না পাইয়া সন্দিগ্ধ মনে গৃহ হইতে বাহির হইয়া দেখিল, সিবিল রোমানেজের সহিত কথা কহিতেছে। অতি আবেগের সহিত সে রোমানেজের প্রেম ভিক্ষা করিতেছে, কিন্তু রোমানেজ স্বামীর প্রতি তাহার এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তীব্র ভাষায় তাহাকে তিরস্কার করিতেছে। হঠাৎ জিওফ্রে সিবিলের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে সেখান হইতে দূর করিয়া দিল। দর্পিতা সিবিল আত্মহত্যার সংকল্প অন্তরে ধারণ করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। বন্ধুকে তাহার অকৃত্রিম বন্ধুত্ব ও বিশ্বাসের জন্য ধন্যবাদ দিয়া জিওফ্রে মনের নির্ব্বেদে কিছু দিনের জন্য বিদেশ যাত্রা করিল। কিন্তু জিওফ্রে গৃহত্যাগ করিবা মাত্র সিবিল বিষপানে আত্মহত্যা করিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে এক খানা পত্রে সে তাহার চরিত্রের এই শোচনীয় অধঃপতনের কারণ লিখিয়া গিয়াছিল। তাহার মর্ম্ম এই যে, 'যে শিথিলনীতি সমাজে সে পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহাতে তাহার এই প্রকার পরিণামই স্বাভাবিক। সামাজিক অবস্থা যত উন্নত হয়, মানুষের অধঃপতনের পথও ততই প্রশস্ত হয়।' কিন্তু বিশ্বাসঘাতিনী সিবিলের সরলতা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। সে সর্ব্বদাই সরল ভাবে জিওফ্রেকে বলিয়াছে, সে তাহাকে ভালবাসে না, তাহার হৃদয় কলুষিত। অভিজাত-সমাজের শিথিল নীতি ও তৎকালীন তরল সাহিত্য অধ্যয়নই যে সিবিলের অধঃপাতের কারণ, সে স্পষ্টাক্ষরেই তাহা বার বার জিওফ্রের নিকট স্বীকার করিয়াছে।

সিবিলের মৃত্যুর পর জিওফ্রে মাবিস ক্লেয়ারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। ক্লেয়ার বিপদে আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া জিওফ্রেকে রোমানেজের সম্বন্ধে অনেক সতর্ক করিয়া দিলেন, তাহার বন্ধুত্ব যে নিরাপদ নহে, একথা স্পষ্ট ভাবেই তাহাকে বলিয়া দিলেন।

অর্থবিত্ত ও আরামের সকল উপকরণ লইয়াও জিওফ্রে এখন দুঃখী। সে এখন অর্থকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিল। শ্বশুরের হস্তে বিষয় সম্পত্তির ভার দিয়া

মনের শান্তি লাভের জন্য জিওফ্রে রোমানেজের সহিত মিশর দেশে ভ্রমণ করিতে বাহির হইল। রোমানেজের নিজের জাহাজ ছিল, সেই জাহাজেই তাহারা যাত্রা করিল। ফিরিয়া আসিবার সময় জিওফ্রে তাহার বন্ধু রোমানেজ ও তাহার জাহাজের নাবিকদিগের মধ্যে, কিছু কিছু অতি-প্রাকৃত ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইল। সপ্তাহের পর সপ্তাহ জাহাজ চলিল, কিন্তু গন্তব্য পথ কিছুতেই ফুরায় না। জিওফ্রে এত দিনে তাহার বন্ধুকে চিনিতে পারিল। সমুদ্রবক্ষে প্রবল ঝটিকা বহিতে লাগিল, ভীষণ দৃশ্যাবলী জিওফ্রের সম্মুখে উপস্থিত হইল। অবশেষে জাহাজ এক অপরিচিত স্থানে উপস্থিত হইল। তখন জিওফ্রে রোমানেজের প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে পাইল। এ যে লুসিফার—সয়তান—ঈশ্বরের সর্ব্বপ্রধান শত্রু! কত অধঃপতিত আত্মা তাহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তাহাকে বন্দনা করিতেছে। তাহার মৃত পত্নী সিবিলের আত্মাকেও সে তন্মধ্যে দেখিতে পাইল।

রোমানেজ তখন তীব্রস্বরে জিওফ্রেকে ভৎর্সনা করিতে লাগিল:—"রে নির্ব্বোধ! আমার সঙ্গে তোর যে দিন প্রথম পরিচয় হইল, সেই দিনই আমি তোকে সতর্ক করিয়াছি, সেই দিনই বলিয়াছি, আমাকে বাহির হইতে দেখিয়া যাহা বোধ হয়, আমি তাহা নই। কুপথ বর্জ্জন করিয়া সুপথে চলিবার জন্য তোর মনে যখনই আগ্রহ দেখিয়াছি তখনই আমি কি তোর মনের সদ্ভাবকে প্রবল হইতে দিতে ইঙ্গিত করি নাই? সহস্র বার তোর হৃদয়কে মঙ্গলকার্য্যে উৎসাহিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি—যাহার প্রভাবে আমি তোর নিকট হইতে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইতাম, এবং আমার শোকে এক বিন্দু সান্ত্বনা, যাতনায় এক বিন্দু বিরাম লাভ করিতে পারিতাম!"

জিওফ্রের ন্যায় ধনীর সংখ্যাই সংসারে বেশী। ধনের আসক্তি তাহাদিগকে মোহান্ধ করিয়া রাখে, সংসারের সুখই তাহাদের সর্ব্বস্ব। যাহা হউক, জিওফ্রের মোহের ঘোর ভাঙ্গিয়া তাহার সম্মুখে আবার শ্রেয় ও প্রেয় এই দুই পথ উন্মুক্ত হইল। সে এখন সংসারের পথে কি ঈশ্বরের পথে চলিবে, এই প্রশ্ন মীমাংসা করিবার প্রয়োজন হইল। কোন্ পথে চলিলে কিরূপ ফল হইবে তাহা দেখিবার দিব্যজ্ঞানও সে লাভ করিল। সয়তান তাহাকে প্রলুব্ধ করিল না। মেরী করেলীর অঙ্কিত সয়তান-চরিত্রের ইহাই বিশেষত্ব। তাঁহার অঙ্কিত সয়তান নিজের মুক্তির জন্য মানুষের কল্যাণ-কর্ম্মের উপরই নির্ভর করে। মেরী করেলী বলিতে চাহেন, মানুষ আত্মবুদ্ধিতে, স্বাধীন ইচ্ছা বলেই পাপের পথে অগ্রসর হয়, অপর কেহ তাহাকে কুপথে লইয়া যায় না।

সৌভাগ্য বশতঃ জিওফ্রের সুমতি হইল, সে সয়তানকে পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরকেই বরণ করিল। তাহার দেশে ফিরিবার পূর্ব্বেই সংবাদ-পত্রে ঘোষিত হইয়াছিল, জাহাজ জলমগ্ন হওয়াতে লক্ষপতি জিওফ্রে টেম্পেষ্ট মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। জিওফ্রে স্বদেশে আসিয়া তাহার বিষয়-আশয় কিছুই ফিরাইয়া লইল না, নীরবে আবার সাহিত্যসেবা আরম্ভ করিল। আবার সেই ক্ষুদ্র ভাড়াটিয়া গৃহে সে আশ্রয় লইল।

দেশে ফিরিয়াও জিওফ্রে রোমানেজকে এক দিন দেখিতে পাইয়াছিল। পাঠক পাঠিকা জানেন কোথায়? —ইংলণ্ডের প্রধান রাজমন্ত্রীর সঙ্গে!

লেখিকা এই পুস্তকে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন:—(১) সংসারে অর্থে সুখ নাই। অর্থে যাহারা সুখান্বেষণ করে তাহাদের ভাগ্যে সুখ মিলে না। (২) মানুষ আপন দোষে, ঈশ্বরের বাণীকে অবহেলা করিয়া পাপের পথে অগ্রসর হয়। (৩) মানুষ যতই অধঃপতিত হউক না কেন, ঈশ্বর তাহাকে পাপের আবর্ত্ত হইতে তুলিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত। (৪) তরল কলুষিত সাহিত্য অনেক নরনারীকে নরকের পথে লইয়া যাইতেছে। প্রকৃত সাহিত্যের প্রকৃতি তিনি এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন:—সাহিত্য এক প্রবল শক্তি, —নরনারীকে চিন্তা করিতে, আশা করিতে, জীবন সংগ্রামে কিছু লাভ করিতে, এই শক্তি সমর্থ করে। এই শক্তি চক্ষু হইতে অশ্রু আকর্ষণ করে, সহস্র নরনারীর হৃদয়ে আনন্দের উদ্রেক করে, অত্যাচারীকে কম্পিত করে, অন্যায় বিচারককে বিচারাসন-ভ্রষ্ট করে। ভণ্ডের

বাহিরের ছদ্ম আবরণ উন্মোচন করে এবং মিথ্যাবাদীর ললাটে স্পষ্টাক্ষরে 'মিথ্যাবাদী' নাম অঙ্কিত করিয়া দেয়।

কবিবর নবীনচন্দ্র।

এ মর জগতে কিছুই স্থায়ী নহে—আজি হউক, কালি হউক, দুই দিন পরে হউক, সকলকেই মৃত্যুর অধীন হইতে হইবে; ইহাই বিশ্বজনীন চিরন্তন নিয়ম। কবিবর নবীনচন্দ্রও এই নিয়মের বশীভূত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি মরেন নাই—তিনি আমাদের দর্শনের বহির্ভূত হইলেও, প্রত্যেকের হৃদয়ে বিরাজমান রহিয়াছেন। তাঁহার অনুপম কাব্যনিচয় তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে, এবং তাঁহার প্রদীপ্ত প্রতিভায় বঙ্গের সাহিত্যাকাশ সমুজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে।

কবিবর নবীনচন্দ্র তাঁহার অনুবাদিত শ্রীমদ্ভগবৎগীতার সূচনায় বলিয়াছেন, "কাব্য ও ধর্ম্মগ্রন্থে রূপগত পার্থক্য থাকিলেও প্রকৃত মনুষ্যত্ব শিক্ষা দেওয়াই উভয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য।" কবিবরের এই মহাবচনের মধ্যে যে মহান্ ভাব নিহিত রহিয়াছে, তাহা তন্ন তন্নরূপে বিশ্লেষণ করিলে কাব্যের ও ধর্ম্মের প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। কবির স্বপ্রণীত কাব্য সমুদয়ে তাঁহার সেই উদ্দেশ্য কতদূর সংসিদ্ধ হইয়াছে, আমরা তাহাই অল্প সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া দেখাইব। তাঁহার সমস্ত কাব্যগ্রন্থ ও খণ্ড-কবিতাসমূহের আলোচনা করিলে, আমরা প্রধানতঃ তিনটী স্তর দেখিতে পাই; প্রথম—তাঁহার কবিত্ব শক্তির উন্মেষ, দ্বিতীয়—তাহার বিকাশ, তৃতীয় তাহার চরম স্ফূর্ত্তিলাভ ও পরিসমাপ্তি।

আপনারা সকলেই জানেন, নবীনচন্দ্রের পিতা ও পিতামহ উভয়েরই হৃদয়ে কবিত্ব ছিল; সুতরাং তিনি কবির বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এ কথা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। কবিত্বশক্তি তাঁহার সহজাত; সেই সহজাত শক্তি তদীয় অপূর্ব্ব প্রতিভা বলে কতদূর মার্জ্জিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছিল, তাহাই দেখিতে হইবে। তিনি যে অনুপম প্রতিভা লইয়া জগতে আসিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কাব্যের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে স্পষ্ট পরিব্যক্ত। দারিদ্র্যের কঠোর অঙ্কুশ তাড়নে, নৈরাশ্যের নিদারুণ মর্ম্মভঙ্গেও তাহা কিছু মাত্র দমিত হয় নাই—বরং তাহার শক্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়াছিল। যে সকল সংবেষ্টক অবস্থানিচয় সেই শক্তির স্ফূরণে সহায়তা করিয়াছিল, তন্মধ্যে তাঁহার জন্মভূমির অপূর্ব্ব নিসর্গ-শোভা প্রধান। সেই জন্মভূমি চট্টলক্ষেত্র—চারিদিকে সৌধকিরিটী অভ্রভেদী গিরিশ্রেণী, তাহার বক্ষে পৃষ্ঠে স্কন্ধে দূর অধিত্যকা-দেশে নাতিনিবিড় অগণ্য কানন-কুন্তল, দূরে সাগরের সফেন তরঙ্গভঙ্গ, মধ্যে গিরিগাত্রে বাড়বানলের লেলিহান দৃশ্য! কবি নিজে বলিতেছেন:—

"পুণ্যতীর্থ সীতাকুণ্ড শোভিছে উত্তরে
কনক চম্পকারণ্য, গর্জ্জিছে দক্ষিণে
হুঙ্কারি বাড়বানল—মানব বিস্ময়!
পশ্চিমে নিরগ্নি কুণ্ড, ব্যাস সরোবর,
বহিতেছে নিরন্তর পূর্ব্বে কলকলে
কলকণ্ঠা মন্দাকিনী স্বরপ্রবাহিনী।"

জ্যোতির্ম্ময়—মনোহর যেন ইন্দ্রজালের উদ্ভবস্থল। যেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে, সেই দিকেই অনন্তের বিরাট বিশাল মহান্ দৃশ্য! এই অপূর্ব্ব দৃশ্যের পরম শক্তিতে জড় ব্যক্তিরও হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠে, কবির কথা ত স্বতন্ত্র।

নিসর্গের সেই অতুলনীয় লীলাক্ষেত্রে, প্রতিভার বিকাশযোগ্য সকল পদার্থের, সকল অবস্থার সেই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সমাবেশস্থলে নবীনচন্দ্রের অপূর্ব্ব কবিত্বশক্তির প্রথম উন্মেষ হইয়াছিল। গিরিতরঙ্গিনী যেমন পর্ব্বতের কোন নিভৃতদেশে উদ্ভূত হইয়া ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইতে থাকে, এবং পরিশেষে বিশালবপু ধারণ করিয়া সাগরসঙ্গমে মিলিত হয়, নবীনচন্দ্রের প্রতিভা চট্টলের সেই চির নবীন, চির মধুর, অনন্ত মহিমাময় মনোহর সৌন্দর্য্যের একস্থলে আবির্ভূত হইয়া, ক্রমে বঙ্গ, ভারতভূমি, অবশেষে সমগ্র জগৎ আলিঙ্গন করিয়াছিল। এই অপূর্ব্ব পরিব্যক্তির আদি শক্তি স্বরূপ চট্টল ভূমি সম্বন্ধে কবি স্বয়ং বলিয়াছেন:—"এই চট্টগ্রাম বড় পুণ্যভূমি—এই আদিনাথ আর ঐ সুদূরে মেঘের গায়ে



মহীশূরের মহারাজা।

চন্দ্রনাথ দর্শন কর। জগতের কোথাও একস্থানে এত তীর্থ নাই।" ইহাতেই চট্টগ্রামের অপূর্ব্বত্ব; এই অপূর্ব্বত্ব লইয়াই চট্টলের শ্রেষ্ঠত্ব, ইহাতেই নবীনচন্দ্রের নবীনত্ব! যে মহান্ অপ্রমেয় ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাসের' অভিনব সৌন্দর্য্য কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহার উদ্ভব এই চট্টলের অনুপম ক্ষেত্রেই।

তাহার পর, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তর। বিপদের স্মৃতি, রোগের যন্ত্রণা, বিষাদের ছায়া, শোকের অশ্রু এই স্তরের ভিত্তিভূমি;—ধর্ম্ম, স্বদেশপ্রেম, বিশ্বপ্রেম, ভগবৎপ্রেম, তাহার প্রধান উপাদান;—শ্রীকৃষ্ণ তাহার আদর্শ;—বুদ্ধ, ঈশা, চৈতন্য, মহম্মদ তাহার এক একটী পবিত্র অঙ্গ। আমাদের নবীনচন্দ্র সেই সকল অনুপম উদার উপাদান দ্বারা সেই বিরাট্, অতি মহান, অনন্ত, বিশ্বব্যাপী অনন্ত ভীমকান্ত সৌন্দর্য্যের আধার আদর্শরূপে সম্মুখে রাখিয়া, স্বীয় অপার্থিব কল্পনার সাহায্যে বঙ্গের কাব্য জগতে অভিনব, অপূর্ব্ব, অতুলনীয় সৃষ্টির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। একমাত্র পলাশীর যুদ্ধ ছাড়িয়া দিলে, অপর সমস্ত কাব্যে তাঁহার এই অপূর্ব্ব সৃষ্টিসামর্থ্যের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়।

আমি এই স্থানে কবির নিজের ভাষায় বলিব, "মহাভারতের পাঠ সমাপন করিয়া দেখিলাম, ভারতের বিগত বিপ্লবাবলীর তরঙ্গ-লেখা এখনও সেই শৈল উপত্যকায় রহিয়াছে। দেখিলাম, তাহার শান্ত দেশ—সেই দৃশ্য, ভাষাতীত ভগবান বাসুদেব ঐ সকল প্রতিভায় গগণ পরিব্যাপ্ত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, এবং অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া পতিত ভারতবাসীর, পতিত মানব জাতির উদ্ধারের পথ দেখাইয়া দিতেছেন।"

এই একটীমাত্র বাক্যে কবির মনোভাব সম্পূর্ণ বুঝা যাইতেছে; বুঝা যাইতেছে, তিনি কি উদ্দেশ্যে মহাভারতের ঘটনাবলী সর্ব্বথা অবলম্বন করিয়াছিলেন। শ্রীভগবানের লীলা প্রকাশ করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য—তাহাই তাঁহার সাধনা, তাহাতেই তাঁহার সিদ্ধি। রৈবতকে ভগবানের আদ্যলীলা, কুরুক্ষেত্রে মধ্যলীলা, প্রভাসে শেষলীলা। রৈবতকে কাব্যের সূচনা, কুরুক্ষেত্রে তাহার বিকাশ এবং প্রভাসে তাঁহার অবসান। যে প্রচণ্ড বিপ্লবে ভারতের আর্য্যবীরকুল নির্ম্মূল হইয়াছিল, জগতের নানা দিগ্‌দেশে আর্য্যসভ্যতা বিসর্পিত হইয়াছিল, ভারতে ধর্ম্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, যাহার ভীষণ প্রভাবে রজঃ ও তমঃ গুণের পূর্ণ পরিভব হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থের মরকত সিংহাসনে সত্ত্বগুণের অমল ধবল প্রশান্ত স্বর্গীয় প্রতিমা স্থাপিত হইয়াছিল, সেই যুগান্তকারী মহাবিপ্লবের প্রদীপ্ত-রেখা রৈবতকের গিরিব্রজে প্রথম দেখা দিয়াছিল। আর্য্য-ভারতের অনন্তশক্তিরূপিণী সুভদ্রার অদ্ভুত রণাভিনয় ও পতিপ্রেম, সত্যভামার দীপ্ত অভিমানজড়িত নানা বৈচিত্র্যময় স্বামিভক্তি এবং রুক্মিণীর অচল অটল ধীরশান্ত অকল্পিত একীভূত পাতিব্রত্য, কোথায় তাহার তুলনা পাইবে? জগতের কোন্ মানবসমাজে, সংসারের কোন্ অমরাবতীতে তাহার সমান চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়?

রৈবতকের সেই সাগরচুম্বিত শৈলশিখরে যে অগ্নি ধীরে ধীরে প্রকাশ পাইল, দাবানল-তেজে কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশান-ভূমে তাহা দিগ্‌দাহী রূপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং প্রভাসের পুণ্যতীর্থে যদুকুলের বিপুল শোণিতসেকে তাহার পর্য্যবসান হইয়াছিল।

কুরুক্ষেত্র কাব্যের একস্থলে দ্বৈপায়নমুখে কবি বলাইয়াছেন:—

"ধনঞ্জয়! শোক তব কর পরিহার,
বিশ্বক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র বিশ্বনিয়ন্তার।
এ বিশ্বের স্তরে স্তরে রয়েছে লিখিত
অভ্রান্ত ভাষায়—নাহি হইতে সৃজিত
ক্ষুদ্রতম জীববীজ, গিয়াছে বহিয়া
কি অনন্ত কাল বিশ্ব ভাঙ্গিয়া গড়িয়া,
ভাঙ্গিতেছে পুরাতন গড়িছে নূতন,
জগতের নীতি এই মহা বিবর্ত্তন।
পুত্র যাবে পৌত্র যাবে প্রপৌত্র আবার,
এই বিবর্ত্তনে শোক কর পরিহার।
সৃজন পালন লয় করিছে সাধন,
মুহূর্ত্তে অনন্ত এই নীতি বিবর্ত্তন।
সেই নীতি এই বিশ্ব করিছে ধারণ,
বিশ্বের এই মূল নীতি ধর্ম্ম সনাতন।

পুত্রশোকার্ত্ত ধনঞ্জয়কে প্রবোধ দিবার নিমিত্ত ভগবান দ্বৈপায়ন তাঁহাকে যে বিবর্ত্তবাদের শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেক বর্ণে জগতের ও মানব সংসারের নীতি ও প্রকৃতি পরিব্যাপ্ত। কুরুক্ষেত্রের মহাসমর সেই মহান্ বিবর্ত্তনের একটী অঙ্ক মাত্র; সেই একটীমাত্র অঙ্কে জগতের যে ভীষণ বিপ্লব সাধিত হইয়াছিল, তাহার মূলতত্ব নিষ্কাম ধর্ম্ম। এই শুনুন, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মহর্ষি দ্বৈপায়নকে কি বলিতেছেন :—

"যে অনন্ত নীতিচক্র, মানুষের মনুষ্যত্ব
করিতেছে ধারণ বর্দ্ধন,
তাহাই মানব ধর্ম্ম, তাহার শিক্ষক শাস্ত্র
কর্ম্ম ধর্ম্ম শিক্ষা ও পালন।
এই মনুষ্যত্ব গতি কি অনন্ত সিন্ধুমুখে!
সিন্ধু—চিদানন্দ নারায়ণ।
অনন্ত এই মনুষ্যত্ব অনন্ত মানবসুখ
মোক্ষ সেই সাগর-সঙ্গম।

কবি এইরূপে পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে মনুষ্যত্বের নীতি ও আদর্শ, পরিণতি ও বিবর্ত্তন সমস্তই অনন্তবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। ইহাই তাঁহার কাব্যের ভিত্তি, ইহাতেই তাঁহার বিকাশ ও পরিসমাপ্তি এবং ইহাতেই আমাদের নবীনের নবীনত্ব। আজি আমরা সকলে মিলিত হইয়া শতকণ্ঠে তাঁহার অক্ষয় স্বর্গবাস কামনা করি, এবং তদীয় অনুপম গুণাবলী বার বার স্মরণ ও কীর্ত্তনপূর্ব্বক তাঁহার পবিত্র স্মৃতি ভক্তি ও প্রীতির পুষ্পচন্দনে বাসিত করিয়া আমাদের হৃদয়মন্দিরে চিরকালের জন্ত স্থাপিত করি। *

মহীশূর মহারাণী-কলেজ।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে মহীশূরের মহারাণী মহোদয়া (বর্ত্তমান মহারাজের মাতা) মহারাণী-কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু সে সময়ে কলেজে ছাত্রী মিলা নিতান্ত সহজ ব্যাপার ছিল না। কয়েক জন উৎসাহী সম্ভ্রান্ত লোক বিশেষ চেষ্টা করিয়া নানা যুক্তিতর্কে অভিভাবকদিগের কুসংস্কার দূর করিতে চেষ্টা করেন, এবং তাহার ফলে ক্রমে ছাত্রীগণ কলেজে আসিতে আরম্ভ করে। দক্ষিণ ভারতে যে সকল বিদ্যালয় স্ত্রীশিক্ষার পথপ্রদর্শক স্বরূপ, এই কলেজ তাহাদের অন্যতম।

কলেজে প্রথমে নিতান্ত প্রাথমিক শিক্ষাই প্রদত্ত হইত। পুরাণ ও শাস্ত্রাদি অবলম্বনে রচিত সুন্দর সুন্দর চিত্র সম্বলিত পুস্তক এই উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। কারণ, আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব ও সদ্‌গুণরাশিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া শিক্ষা দেওয়াই এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। কেনারিজ ও সংস্কৃত ভাষাই প্রথমে শিক্ষা দেওয়া হইত, অবশেষে ইংরেজী ভাষাও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অতি সামান্য অঙ্ক, ভূগোল ও স্বাস্থ্যতত্ব প্রথমে শিক্ষা দেওয়া হইত। সংগীত, শেলাই ও চিত্রবিদ্যার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইত। ব্যায়াম ও বাদ্য শিক্ষার প্রতি লোকের বিশেষ কুসংস্কার ছিল, এজন্য প্রথমে এই দুই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। ৩।২ বৎসরের শিক্ষার ফল অত্যন্ত সন্তোষজনক হওয়াতে কর্ত্তৃপক্ষ নূতন নূতন বিষয় শিক্ষাদানের জন্য আগ্রহান্বিত হইলেন। বাদ্যযন্ত্রের সম্বন্ধে প্রবল কুসংস্কার দূর করিয়া ক্রমে আমাদের জাতীয় যন্ত্র "বীণা" শিক্ষা দিবার আয়োজন করা হইল। পুরস্কার বিতরণ-সভা প্রভৃতিতে ছোট ছোট বালিকাদিগের বীণাবাদন এতই চিত্তাকর্ষক হইতে লাগিল, যে বীণা বাদনের বিরুদ্ধে লোকের কুসংস্কার অতি সত্বর দূর হইল। বালিকাগণ ক্রমে স্কুল মধ্য-পরীক্ষায় উপস্থিত হইয়া তাহাতে উত্তীর্ণ হইতে লাগিল। কিন্তু এইখানেই হঠাৎ তাহাদের শিক্ষা পরিসমাপ্ত হইবার উপক্রম ঘটিল। কারণ, বিবাহের পর আর বালিকারা বিদ্যালয়ে আসিত না। কিন্তু ভগ্নোদ্যম না হইয়া কর্ত্তৃপক্ষ গৃহে গৃহে শিক্ষা দিবার আয়োজন করিলেন। ক্রমে ক্রমে অধিক বয়স পর্য্যন্ত বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে দিতে অভিভাবকগণ সম্মত হইতে লাগিলেন। তাহারা শিক্ষালাভ করিয়া এই কলেজে এবং অন্যান্য বালিকাবিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিতে লাগিল।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে বিদ্যালয়টী এণ্ট্রেন্স স্কুলে এবং ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ইহা কলেজে পরিণত হইয়াছে। ১৯০৫

---

* ঢাকার কবিবর নবীনচন্দ্রের স্মৃতিসভায় শ্রীযুক্ত মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কর্ত্তৃক পঠিত।

খৃষ্টাব্দে বিদ্যালয়ের দুইটী ছাত্রী বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইংরেজী শিক্ষা ব্যতীত এখানে এখন টোলের পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার জন্য "পণ্ডিতী" শিক্ষাও দেওয়া হয়। স্থানীয় "পণ্ডিতী" পরীক্ষায় এই বিদ্যালয়ের একজন ছাত্রী সকল পুরুষ ছাত্র অপেক্ষা অধিক নম্বর পাইয়া উত্তীর্ণ পণ্ডিতদিগের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। সুতরাং এখন এই বিদ্যালয়ে তিনটী বিভাগ আছে :—(১) মাতৃভাষা শিক্ষাবিভাগ (২) ইংরেজী বিভাগ (৩) সংস্কৃত বিভাগ। শিক্ষয়িত্রী কার্য্যের জন্য শিক্ষা লাভ করিতে বিধবাদিগকে বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হয়। সম্প্রতি কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীতে শিক্ষাদান এবং ড্রিল ও টেনিস্ প্রভৃতি ক্রীড়া প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ছাত্রীদিগকে নীতি এবং ধর্ম্ম শিক্ষাও দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভের অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে ছাত্রীগণ বিস্তৃত হলে সমবেত হইয়া ধর্ম্মসঙ্গীত ও স্তোত্র পাঠ করে। সংক্ষেপে মহারাণীর কলেজের শিক্ষাপ্রণালী বর্ণিত হইল।

এখন এই বিদ্যালয়ে লাভজনক কোন গৃহশিল্প শিক্ষা প্রবর্ত্তনের বিষয় আমি কয়েকটী কথা বলিব। শারীরিক পরিশ্রম যে হেয় কার্য্য নহে, বহু শতাব্দী ব্যাপী এই কুসংস্কার দিন দিন দূরীভূত হইয়া যাইতেছে এবং ইহা অতি সদুপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে। সম্ভ্রান্ত গৃহপরিবারে যদি এখন গৃহশিল্প প্রচলিত হয় তবে ভারতবর্ষের অনেক লুপ্তপ্রায় শিল্প পুনরুজ্জীবিত হইবে। অত্যন্ত সুখের বিষয় যে মহীশূরের গত শিল্পপ্রদর্শনী এ বিষয়ে মহীশূরের নারীগণের মনে সদাকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করিয়াছে। এই শিল্প প্রদর্শনীতে "মায়লাপুর মহিলা-সমিতি" এবং ডাক্তার নঞ্জুন্দা রাওএর "নারীগণের গৃহশিল্প সমিতি" হইতে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর শিল্পের নমুনা প্রেরিত হইয়াছিল। এই সকল নমুনা দেখিয়া অনেক মহিলা আপন আপন পরিবারে তাহা প্রস্তুত করিবার জন্য উৎসাহিত হইয়াছেন।

এই উদ্দেশ্যে আমরা মহীশূরের মহারাজ এবং বিদ্যালয়ের অন্যান্য কর্ত্তৃপক্ষকে শীঘ্রই এই অনুরোধ করিব, যে তাঁহারা মহারাণীর কলেজের সংস্রবে শিল্প শিক্ষারও আয়োজন করুন। ইহাতে শুধু একদেশদর্শী শিক্ষার পরিবর্ত্তে বালিকাদিগের শিক্ষা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে। আমাদের সুশিক্ষিত মহারাজা বাহাদুর এ বিষয়ে যত্নশীল হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। *

স্বর্গীয় কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন।

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ দ্বারকানাথ সেনের নাম শুনেন নাই, শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে এরূপ লোক বিরল। আমাদের পাঠকপাঠিকাগণের মধ্যে অনেকেই এই সুবিজ্ঞ কবিরাজ মহাশয়ের সুচিকিৎসার গুণে রোগমুক্ত হইয়াছেন। রুগ্ন, ভগ্নস্বাস্থ্য, নিরাশ ব্যক্তির পক্ষে কবিরাজ দ্বারকানাথ জলন্ত আশার প্রদীপ স্বরূপ ছিলেন। সেই আশার প্রদীপ সহসা নির্ব্বাপিত হইল। বঙ্গজননীর এক শ্রেষ্ঠ পুত্ররত্ন তাঁহার ক্রোড়শূন্য করিয়া চলিয়া গেলেন। বঙ্গবাসী—শুধু বঙ্গবাসী কেন, সমগ্র ভারতবাসী কবিরাজ দ্বারকানাথের মৃত্যুতে দরিদ্র হইল।

ইং ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে দ্বারকানাথ সেন ফরিদপুর জেলার খান্দারপাড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা পূর্ব্ববঙ্গের বৈদ্যসমাজের শ্রেষ্ঠ কুলীন শক্তি-গোত্রীয় হিন্দুসেন-বংশীয়। কবিরাজ মহাশয়ের বংশ শাস্ত্রচর্চ্চার জন্য চির প্রসিদ্ধ। এই পরিবারে খ্যাতনামা অভিরাম কবীন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন; তিনি রাজা সীতারাম রায়ের সভার প্রধান পণ্ডিত ও রাজবৈদ্য রূপে বঙ্গদেশে সুপরিচিত ছিলেন। অভিরাম কবীন্দ্র "মহামহোপাধ্যায়" উপাধিভূষিত ও স্বসমাজের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার ছিলেন। অভিরামের পুত্র দুর্গাদাস শিরোমণি পিতার সুযোগ্য পুত্র এবং শাস্ত্রচর্চ্চায় বিশেষ কৃতী ছিলেন। দ্বারকানাথের বৃদ্ধ প্রপিতামহ সুপ্রসিদ্ধ শঙ্কর কবিরাজের ছাত্র গোপাল কর "রসেন্দ্রসারসংগ্রহ" নামক বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই পরিবারে বংশানুক্রমে যে টোল প্রচলিত আছে তাহাতে বঙ্গীয় অনেক শ্রেষ্ঠ কবিরাজ শিক্ষালাভ করিয়াছেন। কুমারটুলির প্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ

* মহারাণী কলেজের শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী শ্রীরঙ্গাম্মল বি, এ, কর্ত্তৃক ভারত-মহিলা পরিষদের বিগত অধিবেশনে পঠিত।

সেনের স্বনামধন্য পিতা নীলাম্বর কবিরাজ দ্বারকানাথের পিতামহ রামসুন্দর কবিরাজের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

দ্বারকানাথ প্রথম বয়সে অল্পদিন বিক্রমপুরের সংস্কৃত চতুষ্পাঠিতে অধ্যয়ন করিয়া মুর্শিদাবাদের অদ্বিতীয় পণ্ডিত গঙ্গাধর কবিরাজের টোলে ন্যায়, দর্শন, উপনিষদ প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হন। সঙ্গে সঙ্গে আয়ুর্ব্বেদও এই স্থানে পঠিত হয়। গঙ্গাধরের টোলের গৌরব তাঁহার প্রিয় শিষ্যের সময়ে উজ্জ্বলতা লাভ করিয়াছিল।

ইং ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে দ্বারকানাথ কলিকাতায় জাতীয় ব্যবসায় আরম্ভ করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার চিকিৎসার সুযশঃ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়, এবং তিনি ক্রমে ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসকগণের শীর্ষস্থানীয় হইয়া উঠেন। ভারতবর্ষের নানাস্থানের রাজন্যবর্গ ইঁহাকে সম্মানের সহিত পারিবারিক চিকিৎসার জন্য আহ্বান করিতেন, এবং সাধারণ লোক ইঁহার পাণ্ডিত্য ও চিকিৎসানৈপুণ্যের এরূপ পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, অনেক রোগী ইঁহার দর্শন লাভ মাত্রেই যেন রোগমুক্ত হইলেন, এরূপ মনে করিতেন; ইনি জীবনে কোনও বিজ্ঞাপন দ্বারা আত্মপ্রচার করেন নাই, অথচ ইঁহার নাম বঙ্গের ঘরে ঘরে প্রচারিত ছিল। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে মেওয়ারের যুবরাজ বাহাদুরের বিশেষ অসুস্থতার নিমিত্ত তথাকার মহারাণা বাহাদুর গবর্ণমেণ্টের নিকট ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিরাজকে যুবরাজের চিকিৎসার জন্য পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া পত্র লেখেন। সরকার বাহাদুর দ্বারকানাথকেই এই কার্য্যে মনোনীত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি প্রদান করেন। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের মধ্যে ইঁহার পূর্ব্বে আর কেহ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এই উপাধি লাভ করেন নাই। মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ সেন কবিরত্ন বহুলোকের আশ্রয়স্বরূপ ছিলেন। এরূপ নিরভিমান, উদারহৃদয় আশ্রিতবৎসল মহাজন একালে বিরল। তিনি আয়ুর্ব্বেদ ও বহুশাস্ত্রে যেরূপ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, বঙ্গদেশে সর্ব্ববিষয়ে তাহার সমকক্ষ ব্যক্তি আর নাই; তাঁহার মৃত্যুতে আজ বহুরোগী হতাশ হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালী তাঁহাকে ধন্বন্তরি জ্ঞানে শ্রদ্ধা করিত। চিকিৎসক শুধু স্বপরিবারের আশ্রয় এবং রক্ষক নহেন, সর্ব্বসাধারণেও চিকিৎসককে আশ্রয়স্থান বলিয়া মনে করে; কবিরাজ মহাশয়ের জন্য যে শোক, তাহা আজ শুধু বঙ্গদেশের নহে, সমগ্র ভারতবর্ষের আয়ুর্ব্বেদভক্ত জনসাধারণের। মূলতান, জয়পুর, লাহোর, দিল্লী, রত্নগিরি, হায়দারাবাদ, বম্বে, মাদ্রাজ, প্রভৃতি অনেক স্থানেই ইঁহার ছাত্রমণ্ডলী আছেন। ইনি নিজের ব্যবসায় এবং ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের সহিত সংস্কৃত শাস্ত্র আলোচনায়ই সমস্ত সময় যাপন করিতেন না, রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের সহিতও ইঁহার বিশেষ সহানুভূতি ছিল।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের প্রতি তাঁহার অসাধারণ ভক্তি ছিল, তাঁহাদের নিকট কখন দর্শনি লইতেন না। ছাত্রদিগকে ইনি পুত্রের ন্যায় পালন করিতেন।

তিনি উৎকৃষ্ট কবি, বৈয়াকরণিক ও আলঙ্কারিক ছিলেন, স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্রে ইঁহার পাণ্ডিত্য দেখা গিয়াছে; ইনি সুশ্রুতের টীকা লিখিতেছিলেন; করাল কাল তাহা আর সমাধা করিতে দিল না। ছয়মাস পূর্ব্বে কবিরাজ মহাশয়ের একটু সামান্য জ্বর ও পেটের অসুখ হয়, তাহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া উদরী রোগে পরিণত হয়। গত ভাদ্র মাসে কাশীধামে যাইয়া কতকটা সুস্থ হইয়াছিলেন। গত ১৬ই মাঘ কলিকাতা ফিরিয়া আসিবার পর হইতে রোগ ভয়ানক বাড়িয়া উঠে, এবং এই রোগেই ২৯এ মাঘ বৃহস্পতিবার রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় তিনি স্বর্গারোহণ করেন।

কবিরাজ মহাশয় তিন পুত্র, পাঁচ কন্যা, দুই পৌত্র, দুই পৌত্রী, তিন দৌহিত্র ও পাঁচ দৌহিত্রী রাখিয়া গিয়াছেন।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত এবং ২১০।৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ভারত-মহিলা কার্য্যালয় হইতে শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ভারত-মহিলা

সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

শ্রীসরযূবালা দত্ত

সম্পাদিত।

চতুর্থ খণ্ড।

১৩১৫

ঢাকা;

উয়ারী, "ভারত-মহিলা" কার্য্যালয় হইতে

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য ২।০ দুই টাকা চারি আনা।

চিত্রের সূচী